সন্ন্যাসী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ কর্ত্তৃক ২২।১নং কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীটস্থ শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত
ও শিশির প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

মূল্য এক টাকা

মান্যবর

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

সুহৃদ্বরেষু—

সামান্য বাঙালী নিজের চেষ্টায়, অধ্যবসায় ও কৃতিত্বে কত ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত নিদর্শন—আপনি; স্নেহ ও ভালবাসার স্পর্দ্ধা কত উচ্চে উঠিতে পারে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, এই ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থের এই উপহার পৃষ্ঠা খানি।

প্রীতিমুগ্ধ

মহালয়া — শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১৩৪৮

সন্ন্যাসী

১

বাড়ীটা এত বড়, গেট টা এত ভারী, গেটের রক্ষকদের চেহারাগুলা এত রুক্ষ, আর তাহাদের পোষাক-আষাক এত জমকালো যে কস্মিন্‌কালে অতিথি ফকির সন্ন্যাসী ভিখারী সে দেউড়ী অতিক্রম করিতে সাহস করিত না—কাজে কাজেই, বাঙালী-গৃহস্থের গৃহ হইলেও এক মুঠা চাউলের প্রত্যাশা ছাড়া।

একদিন এক দুঃসাহসী সন্ন্যাসী কোন্ ফাঁকে সেই ভারী গেট পার হইয়া একেবারে সদর-অন্তঃপুরের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নির্ভীক নিষ্কম্পকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, নারায়ণ।

সদরে সেন সাহেব জুনিয়রদের লইয়া কনসালটেসনে বসিয়াছিলেন, চোখ তুলিলেন, কতকটা বিরক্তও হইলেন কিন্তু তখনই কিছু একটা করিবার সুবিধা না থাকায় আবার সেই ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানকল্পেই মনঃসংযোগ করিলেন। একটা ভারী মামলার ভারী জটিল সমস্যা উদ্ভুত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরের দালানে বসিয়া গৃহকর্ত্রী তরকারী কুটিতেছিলেন। অপরিচিত, উদাত্ত কণ্ঠের নারায়ণ স্মরণে তিনিও চমকিয়া উঠিলেন;

সম্মুখে প্রাচীরগাত্রে বিলম্বিত দীর্ঘ মুকুরে যে সুদীর্ঘ মূর্ত্তিটি প্রতিবিম্বিত হইল, তাহাতে বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এ বাড়ীতে এই শ্রেণীর লোকের পদার্পণ এই প্রথম!

গৃহকর্ত্রী সদ্যঃস্নাতা, তৈলনিষিক্ত কেশদাম পৃষ্ঠে আলুলায়িত, ছিপ-ছিপে চেহারা, বর্ণ সুগৌর, সূক্ষ্ম একখানি ডুরে কাপড়ের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ যৌবনশ্রী প্রস্ফুট। বঁটির পাশে একজোড়া লাল মখমলের পাতলা চটি ছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টিমাত্র না করিয়া খালি পায়ে বারান্দায় বাহির হইয়া, হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া সাগ্রহে বলিল, আসুন।

সন্ন্যাসী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সরযূ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। ঘুমের ভিতুরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মানুষ ঘুমন্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেভাবে বিলীয়মান স্বপ্নের পানে চাহিয়া থাকে, শোভন-অশোভন জ্ঞানশূন্য হইয়া সরযূ সেইভাবে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী সংস্কৃতে কহিলেন, ভিক্ষাং দেহি।

সরযূর চমক ভাঙিল; লজ্জায় আপাদমস্তক যেন কাঁপিয়া উঠিল। ত্রস্তে ব্যাকুল আঁখি নামাইয়া লইয়া বলিল, বসবেন আসুন।

ঝি কোটা তরকারীগুলি থালায় করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সরযূ তাহাকে ডাকিয়া আসন আনিতে বলিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আসনের প্রয়োজন নাই মা। চারজনের অন্ন ভিক্ষা করি।

সরযূ হাসিয়া বলিল, সে ত হবেই, একটু বসুন।

ঝি এই সময়ে আসন আনিয়া বিছাইয়া দিল, অল্পভাষী সন্ন্যাসী বাদ

প্রতিবাদ না করিয়া বসিলেন। স্কন্ধরক্ষিত থলিয়াটি আসনের সামনে রাখিলেন।

সরযূর একমাত্র কন্যা উঠানের ওদিকে হরিণঘরের কাছে দাঁড়াইয়া হরিণ দু'টাকে ঘাস দিতেছিল, রোয়াকে অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত জীবের সঙ্গে মা'কে কথা কহিতে দেখিয়া, হরিণের প্রতি অপরিসীম স্নেহ বিস্মৃত হইয়া, মা'র কাছে আসিয়া, মা'র জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া এই অষ্টম আশ্চর্য্য দেখিতে লাগিল।

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, কি দোষ বলুন?

সন্ন্যাসী সহজ স্বাভাবিককণ্ঠে কহিলেন, চার জনের মত অন্ন ব্যঞ্জন।

বঙ্গনারীর স্বভাবসুলভ স্নিগ্ধকণ্ঠে সরযূ বলিল, একটু বসুন, আমি আনতে বলে আসি।

সরযূ চলিয়া গেল; তাহার মেয়েও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। সন্ন্যাসী সেইখানে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে মেয়ে ফিরিয়া আসিল। তাহার কচি ও ক্ষুদ্র মনটিতে যুগপৎ কৌতূহল ও ভয় লুকোচুরী খেলিতেছিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত কৌতূহলই জয়ী হইয়াছে; মা'ও নির্ভয় করিয়া দিয়াছেন—মেয়ে অল্প একটু দূরে পুষ্পিত তরুলতা জড়ানো একটা লৌহস্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন, ওগো ও ছবির মত মেয়েটি, আমার কাছে আসবে?

ছবির মত মেয়েটি কথার জবাবও দিল না, কাছেও গেল না। মা যত নির্ভয়ই করিয়া দিক্, কাছে যাইতে সাহস হয় না। তবে, না দেখিয়াও থাকা যায় না।

পরিচারিকার হাতে থালা, চাকরের ঘাড়ে ধামা দিয়া সরযূ ফিরিয়া

আসিল। সন্ন্যাসী হাসিতেছিলেন, সরযূ কাছে আসিলে স্মিতহাস্যে কহিলেন, এ যে মহোৎসবের আয়োজন, মা।

সরযূ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কি?" বাস্তবিক এই সকল শব্দের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ তাহার কোনদিন হয় নাই।

সরযূ তাঁহার পানে একাগ্র দৃষ্টি ফেলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, সন্ন্যাসী কহিলেন, বড় বড় উৎসবের সময় আমরা ঐ রকম ভিক্ষাই যাচ্ঞা করি বটে। তখন অনেক অতিথি, বহু অনাথ, আতুর সমাগম হয় কি-না!

সরযূর নির্দ্দেশমত ঝি ও চাকর পাত্র নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলে, সরযূ হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, কিসে নেবেন ঠাকুর?

—এই যে মা, আমার থলি। বলিয়া গৈরিকরঞ্জিত ক্ষুদ্র থলিয়াটি তুলিয়া ধরিলেন।

—ওতে কটা চালই বা ধরবে ঠাকুর?—সরযূ হাসিল।

—আমার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, মা। সন্ন্যাসী থলিটি ফাঁক করিয়া ধরিলেন, বলিলেন, নারায়ণ আজ অন্নপূর্ণার স্বহস্ত প্রদত্ত অন্ন অদৃষ্টে লিখেছেন, তুমি হাতে ক'রে তুলে দাও মা!

ক্ষুদ্র থলি দেখিয়া সরযূ অপ্রসন্ন হইয়াছিল। অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখেই ধামার চালে হাত দিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, অন্নপূর্ণার হাতের আট মুষ্টি চাল হ'লেই আমাদের হবে। আজ আমরা চারজন ভোক্তা,—তিনজন অতিথি, আর আমি।—আর নয় মা!

—ঐ ক'টি? না, না, তা কখনও হয়?

—ঐ আমাদের মাপ, মা! এইবার চারটি তরকারী তুলে দাও মা।

সরযূ রাগ করিয়া মিষ্ট হাসিয়া কহিল, আমি পারবো না, আপনার যা খুসী, তুলে নিন্।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, তা যে হবার নয় মা। ভবতু ভিক্ষাং দেহি, তুমি দেবে, আমি হাত পেতে নোব। এই যে! তুমি দিচ্ছ, দাও—সরযূর মেয়েটি একটি বেগুন তুলিয়া সন্ন্যাসীর পানে অগ্রসর করিয়া ধরিয়াছিল, দিবারই ইচ্ছা, কিন্তু দিতে সাহসে কুলায় না। সন্ন্যাসী হাত বাড়াইতেই বেগুনটা তাঁহার হাতে দিয়া, একগাল হাসিয়া মা'র দিকে চাহিল। সরযূ হাসিয়া রাগিয়া বলিল, লীনা, তুই দিস্ নে, ওঁর ইচ্ছে হয় নেবেন, না-হয়—

লীনা সে কথা গ্রাহ্য করিল না; আর একটি পুষ্টকায় বেগুন সন্ন্যাসীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, না, আমি দোব।

সন্ন্যাসী সরযূর দিকে চাহিয়া মধুরকণ্ঠে কহিলেন, করুণাময়ীর সন্তান করুণাময়ীই হয় মা। লীনাকে বলিলেন, দাও ত মা আর দু'টি বেগুন।

লীনার তখন সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। দু'টা নয়, দুই-হাতে চারটা বেগুনের বোঁটা ধরিয়া হাসিয়া বলিল, এই নিন্।

—দু'টি দাও মা।

সন্ন্যাসী থলের মুখ বন্ধ করিলেন দেখিয়া লীনা বলিল, এ দু'টো?

সন্ন্যাসী কহিলেন, আজ আর নয়, আর একদিন এসে নোব, মা।

সরযূ একদৃষ্টে চাহিয়াছিল; দেখিতে দেখিাত তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, পাছে সন্ন্যাসীর সামনেই চোখের জল ঝরিয়া পড়ে, ওদিকে ফিরিয়া ধাক্কাটা সামলাইয়া লইল।

সন্ন্যাসী অত শত বুঝিলেন না ; কহিলেন, মা, আরও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা আছে।

সরযূ মুখ ফিরাইল ; কিন্তু চোখ তুলিতে পারিল না ; মনে হইতেছিল, চোখের পাতায় জল জমিয়া আছে।

সন্ন্যাসী কহিলেন, চারটি পয়সা বাকী আছে, মা।

সরযূ আসিবার সময় হাতের কাছে যে দু'তিনটা টাকা পাইয়াছিল, অঞ্চলাগ্রে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, টাকা দিলে হবে না ?

—চারটি পয়সার বেশী যে লাগবে না মা।

—পয়সা আমার কাছে নেই !—সরযূ টাকা ক'টা দেখাইল।

মেয়ে বলিল, আমার পকেটে আছে, এই যে—একটা আনী বাহির করিয়া দেখাইল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, মা লক্ষ্মী, আনীটি আমায় দিয়ে তুমি মা'র হাতের টাকাগুলি পকেটে রাখ।

মেয়ে তাহাতে খুব রাজী। তৎক্ষণাৎ সানন্দে আনীটি সন্ন্যাসীকে দিয়া, মা'র প্রসারিত অঞ্চলাগ্র হইতে টাকা ক'টি তুলিয়া লইয়া পকেটে ফেলিল এবং যে সন্ন্যাসী এতটা বুদ্ধি তাহাকে দিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা যে কতখানি বাড়িয়া গেল, তাহা বলিবার নয়। সন্তঃপ্রাপ্ত তিনটাকার একটা দান করিতেই ইচ্ছা !

সন্ন্যাসী কহিলেন, অনুমতি কর মা, এবার যাই।

সরযূর চোখ দু'টা আবার কাঁপিতে সুরু করিয়াছিল, বলিল, ঐতেই আপনার হয়ে যাবে ?

—হবে বৈ কি মা!—বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিলেন, না-ই যদি হবে, অন্নপূর্ণার দান সমস্তই ত নিয়ে যেতে পারতুম মা।

তারপর থলিয়াটির মুখ দড়ি দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, মা, সন্ন্যাসীর লোভ করতে নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষা করা দোষ, সঞ্চয় করা পাপ, অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া তার ধর্ম্ম! দুঃখিত হয়োনা মা। দৈনিক ভিক্ষায় আমরা বেশী নিতে পারি নে বটে, কিন্তু আশ্রমের কত রকমের প্রয়োজন দেখা যায় মা, তখন অনেক বেশী দাবী নিয়েই আমাদের গৃহস্থের দ্বারে যেতে হয়। কত দ্বার থেকে রিক্ত হস্তেই ত ফিরতে হয়, চাকর দারোয়ানে লাঞ্ছনাও যে না করে, তা নয়। আজ যেখানে আদর, কাল অনাদর; আবার আজ যেখানে অনাদর, কাল সেখানেই সমাদর। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না; কেউ বলে কুঁড়ের সর্দ্দার, ভিক্ষা দিলে কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া হয়; কেউ বলে, তা হোক্, মান খুইয়ে দোরে এসে দাঁড়িয়েছে, মুষ্টিভিক্ষা বৈ ত নয়—দিয়ে দাও। কেউ কেউ কুকুর লেলিয়ে দেয়। এই সাজসজ্জা-গুলোর ওপর কুকুরদেরও এমনি রাগ যে লেলিয়ে দিলে ত কথাই নেই, অমনিতেও আধক্রোশ পর্য্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এমন অনেকদিন যায়, মা—

হঠাৎ থলি ঘাড়ে দাঁড়াইয়া উঠিতেই দেখিল, সরযূর মুখখানি জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী থামিয়া গেল। মেয়ে মা'র চোখে জল দেখিয়া পকেটের টাকা বাজানো বন্ধ করিয়া মা'র গায়ে গা দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সন্ন্যাসী এক মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস

ফেলিয়া বলিলেন, সাধে কি আর ভক্ত কবিরা অন্নপূর্ণাকে বাঙালীর মেয়ে ক'রে এঁকেছেন? ঐ মূর্ত্তি যে বাঙলার ঘরে ঘরে! নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন মা। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে, কনসাল্‌টেসন তখন ভারি জমাট, বিভাস সাহেবের মুখ তুলিয়া চাহিবারও অবসর নাই। থাকিলে, সন্ন্যাসীর অদৃষ্টে বিড়ম্বনা লিখা ছিল।

কিন্তু বিড়ম্বনা অন্যত্র ছিল। দরোয়ানজীগণ সমস্বরে কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন এবং চুপসে ঘুসিয়া যাওয়ার জন্য যে সকল কর্ণকুহরশীতলকর বাক্যাবলী প্রয়োগ করিলেন, তাহা তাঁহাদের শ্রীমুখ ছাড়া অন্য কোথায়ও বোধ করি স্থান অথবা শোভা পায় না।

সরযূ সেই বারান্দাতেই দাঁড়াইয়াছিল—অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দরোয়ানের হাতে সন্ন্যাসীর নিগ্রহ দেখিল। বিকালবেলা দরোয়ান তিনটাকে ডাকিয়া ধমকাইয়া দিয়া হুকুম করিল, ঐ সন্ন্যাসী যখনই আসিবেন, আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে।

দরোয়ানরা বলিতে গেল, লেকিন্ সাহাব—

সরযূ থামাইয়া দিয়া বলিল, তার জন্য তোমাদের ভাবনা নাই, সাহেব যা বলেন, আমায় বলবেন।

দরোয়ানরা লম্বা সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিয়া বলিল, লেকিন ঔর কিসিকো—

সরযূ তাহাদের বক্তব্যটা বুঝিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, না-না, অতিথি ফকির সন্ন্যাসী কাউকেই তাড়িয়ো টাড়িয়ো না।

দরোয়ান সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

সরযূ বলিল, আমি সরকার মশাইকে ব'লে দোব দু' এক মণ মোটা চাল আর কিছু আধলা পয়সা তোমাদের কাছে দিয়ে রাখবে, ভিখিরি টিখিরি এলে—তোমরা দিয়ে দিতে পারো! নাই বা এলো তারা বাড়ীর মধ্যে।

—জী হুজুর, বলিয়া দরোয়ানরা প্রস্থানোদ্যত হইল।

তাহারা অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল, সরযূর কেমন যেন একটা খটকা লাগিয়াছিল, আবার ডাকিয়া বলিল, কিন্তু যে সন্ন্যাসী আজ এসেছিলেন, তাঁকে যেন ঐখেন থেকে বিদেয় করো না।

—নেহি হুজুর, ও তো হামলোক শুন্ লিয়া।

ভিক্ষারও যে একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, ভিক্ষা দিতে আনন্দ হয়, দিবার জন্য একটা ঔৎসুক্য জাগে, ভিখারীকে বিমুখ করায় অন্তরে বেদনা বাজিবার সম্ভাবনাও হইতে পারে, সরযূর নিকট এ সকল নূতন তথ্য। এই তথ্য কেহ তাহাকে শিখাইল না, কেহ উপদেশ দিল না, বলিয়াও দিল না। যে আবেষ্টনীর মধ্যে তাহারা মানুষ, যে পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস ও চলাফেরা, এই সকল তুচ্ছ, একান্ত অবজ্ঞেয় কথা লইয়া সেখানে কেহ মাথা ঘামায় না। সরযূও কোনদিন ভাবে নাই। আজ একটি নির্লিপ্ত নির্লোভ উদাসীন তাহার অল্প আকাঙ্ক্ষা ও অত্যল্প যাচ্ঞা লইয়া তাহার দ্বারস্থ হইল, যাহাকে উপরোধ অনুরোধ করিয়াও তাহার প্রয়োজনের অধিক একটি কণা লইতেও বাধ্য করা গেল না, অথচ দাবীটা তাহার কত না স্পষ্ট। যেন জন্ম জন্মান্তর, যুগ যুগান্ত ধরিয়া সরযূর কাছে এই দাবী সে গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছিল। ন্যায্য পাওনা পাওয়ামাত্র

চলিয়া গেল—এক পয়সা বেশী নয়, একটি পাই কম নয়—কড়ায় গণ্ডায় হিসাব মিলাইয়া লইয়া নির্ম্মল হাসিমুখে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সেই দিন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে এই চিন্তাই সরযূর মনের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল, সন্ন্যাসী আবার কবে এই রোয়াকটির প্রান্তে দাঁড়াইয়া নারায়ণ স্মরণ করিবে।

এখন, লেখকের একটি সবিনয় নিবেদন আছে। আমি নিন্দার উদ্দেশ্যেই নিন্দা করিতেছি না, একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া নিতান্ত দরকার বলিয়াই এই কথাগুলা বলিতেছি। যে সমাজের লোক ইহারা, সে সমাজে সরযূ কয়টি আছেন জানি-না, থাকিলেও সংখ্যা যে একেবারেই কম, তাহা জানি। অতিথি-ফকির ত তুচ্ছ কথা, দরিদ্র আত্মীয় স্বজনদের এই সকল বাড়ীতে ঢুকিতে পা ত কাঁপেই, বুকও দুরু দুরু করিতে থাকে। সমান অবস্থার, সমান পদবীর, সমশ্রেণীর সঙ্গে কার কারবারই চলে, উচ্চস্তরেও অরুচি নাই—নীচের দিকে গতিবিধি ত দূরের কথা, দৃষ্টি দেওয়াটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় বলিয়াই বিবেচিত হয়। সেই গণ্ডীর বাহিরে যে বিশাল জগৎ, তাহার অস্তিত্বে কিছুমাত্র সন্দেহ তাঁহাদের নাই; তবে তাহার সহিত তাঁহাদের যে সুদূরের যোগ থাকিতে বা জন্মাইতে পারে, ইহা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর। এ যেন টবে ফোটা চন্দ্রমল্লিকা। শোভা ও সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই, কিন্তু ঐ টবটিই তাহার দুনিয়া। টবের মাটীর বাহিরে যে মাটী, তাহার খবর না রাখিয়াই সে বিকশিত।

সন্ন্যাসীর মুখে সরযূ কি দেখিয়াছিল জানি-না, তবে দারিদ্র্য অথবা

ঔদাসীন্যের সুস্পষ্ট রেখাগুলিই চন্দ্রমল্লিকা-সমাজের এই ধনবতী যুবতী নারীকে বিচলিত করিয়াছিল এ কথাও ঠিক নয়; তবু যে সেটা কি, এবং কিসের জন্যই বা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং অনিদ্রায় কোন কোন দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একটি দিন একটি দণ্ডের দেখা মুখখানা সে কেন অহরহ ভাবিত, এ কথাটা, বোধ করি, জিজ্ঞাসা করিলে, সে নিজেও সুস্পষ্ট করিতে পারিত না। হয়ত বা লজ্জাই পাইত।

কোনও এক সময়ে, একান্ত নিভৃতে এবং কাহারও আসিবার কোন সম্ভাবনা যখন নাই এই রকম একটা সময়ে সরযূ ছবির এ্যালবাম্‌খানা বাহির করিয়া, একখানা ছবি খুলিয়া বসিল। বহুদিনের পুরাণো ছবি, স্থানে স্থানে বর্ণ অস্পষ্ট, রেখা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, সরযূ সেই দিকে চাহিয়া সকলই ভুলিয়া গেল। কখন যে তাহার অজ্ঞাত-সারে চোখের জল ঝরিয়া মুখ ভাসাইয়া দিয়াছে, বুকের কাপড় ভিজাইয়াছে, হাতের সোনার চুড়িগুলায় পড়িয়া সোনা চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে, কিছুই টের পায় নাই; টের পাইল তখনই, যখন এক ফোঁটা জল সেই ছবিটার উপরে পড়িল। তাড়াতাড়ি এ্যালবামখানিকে পাশের আসনে নামাইয়া রাখিয়া কাপড় দিয়া চোখ, মুখ, চুড়ীগুলা মুছিয়া সেই কাপড়েরই শুষ্ক অংশ দিয়া পরম স্নেহে যত্নে জলের ফোঁটাটি তুলিয়া ছবিখানির অঙ্গহানি হইয়াছে কি-না বার বার পরীক্ষা করিয়া, আবার যখন এ্যালবামখানি কোলের উপর টানিয়া লইতেছিল, সিঁড়িতে কাহার জুতার শব্দ শুনিয়া, এ্যালবাম মুড়িয়া আলমারীর ভিতরে তুলিয়া ফেলিল। জুতার শব্দ যাহারই হউক, এদিকে আসিল না। কিন্তু সরযূ এ্যালবাম্‌-খানিকে আর বাহির করিল না। আজিকার সন্ন্যাসীর সঙ্গে চিত্রখানির

যে অবিকল হুবহু সাদৃশ্য তাহা তাহার মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, মিলাইয়া লইবার জন্য তাহার মনই যথেষ্ট, অন্য উপকরণ বা উপাদানের কোন প্রয়োজনই আর ছিল না। নির্জ্জন নিশীথে অন্ধকারেও সেই জীবন্ত ও চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তির সাদৃশ্য তাহাকে ঘুমাইতে দেয় না। শুধু কি তাই? বিনিদ্র চোখের পাতা ভেদ করিয়া সাগর বহিয়া যায়! সন্ন্যাসী কোথা হইতে আসিয়া এ কি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল!

২

প্রায় একমাস পরের কথা।

শ্বেত পাথর বাঁধান রোয়াকের উপর মস্ত দাঁড়ে একটা মস্ত কাকাতুয়া শিকলে বাঁধা থাকে। সরযূ দাঁড়ের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে খাবার দিতেছিল, হঠাৎ চক্ষু তুলিতেই দেখিল, সন্ন্যাসী। হাত কাঁপিয়া গেল; বাটীসুদ্ধ ছোলা দাঁড়ের বাটীতে না ঢালিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়া, বাটীটা নামাইয়া রাখিয়া, হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, অন্নপূর্ণা, বড় দায়ে পড়ে সকালেই আপনার দরজায় হাত পাততে এলুম।

সরযূ বলিল, বলুন।

ভারতানন্দ কহিলেন, বার জন সন্ন্যাসী সাগর-তীর্থে যাবার সঙ্কল্প ক'রে বেরিয়েছেন, সাগরে এখন প্রচণ্ড শীত, অথচ গায়ের একটি চাদর পর্য্যন্ত নেই। তাই ভাবলুম, মা যদি দয়া ক'রে বার খানি কম্বল হুকুম ক'রে দেন—

সরযূ বলিল, কখন্ চাই?

সন্ন্যাসী কহিলেন, তবে আর দায় বলছি কেন মা? তাঁরা বারটার

সময় যাত্রা করবেন, পাঁচ জায়গা ঘুরে সংগ্রহ করতে পারি কিন্তু অনেক সময় লাগবে, চাই-কি, একদিনে সব ক'খানি হয়ত পাবও না, তাই ত ভাবলুম, আমার অন্নপূর্ণার অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকতে ভাবনা কিসের?

সরযূ বলিল, আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি এখনি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

—আমি এখানেই আছি মা!

কাকাতুয়াটা এতক্ষণ নীরবে সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিল, বুঝি বা রাগে ফুলিতেছিল, সরযূ অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়াইতেই চীৎকার করিয়া উঠিল, যা—যা—যা!

সন্ন্যাসী কহিলেন, মা, তোমার পাখীটির, দেখি, দেউড়ীর দরোয়ানদের চেয়েও কড়া মেজাজ, আমাকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।

সরযূ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, হাসিয়া বলিল, ওর ঐ একটিই বুলি। সকলকেই যা-যা করে। আপনি ভেতরে এসে বসবেন আসুন-না।

—শীতের মধুর রৌদ্রটুকু থেকে কে বঞ্চিত হতে চায় মা?

—আমি আসছি এখনি, বলিয়া সরযূ চলিয়া গেল এবং দু' তিন মিনিটের মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক লোক সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আপনি এঁর সঙ্গে যান্, যেমন কম্বল দরকার, দেখিয়ে দিলেই উনি কিনে দেবেন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, যেমন-টেমন নয় মা, বাহারে টাহারেও নয়, সাদাসিদে মোটা কম্বল হলেই হবে।

সরযূ কহিল, বেশ ত, তাই দেখিয়ে দেবেন। যান্ সরকার মশাই।

—যে আজ্ঞে, চলুন।

সরযূ আবার বলিল, আর যদি কিছু দরকার থাকে, তা'ও বলবেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, না মা, আজ আর কিছু নয়।

সরযূ সরকার মহাশয়কে একপাশে ডাকিয়া লইয়া আর একটা কি বলিল, সরকার সবিনয়ে কহিল, যে আজ্ঞে।

সরকার মহাশয় সন্ন্যাসী সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলে সরযূ সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এই সন্ন্যাসীটি বোধ করি মোহিনী বিদ্যা জানিত। নতুবা কেন বারবার সরযূর ইহাই মনে হয়, ইহাকে অদেয় তাহার বিশেষ কিছুই নাই। অথচ লোকটির যাজ্ঞা কত তুচ্ছ, কামনা কত নগণ্য।

বিভাস সাহেব কনসালটেসন শেষ করিয়া দ্বিতলে উঠিতেছিলেন, স্ত্রীকে উঠানের রোয়াকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেখানে আসিয়া হাসিমুখে কহিলেন, উটি আজ আবার কি মনে করে শুভাগমন করেছিলেন? চারজনের, না পাঁচজনের অন্ন? তার বেশী নয় ত?

সরযূ কোন উত্তর দিল না, তাহার মুখে একটু খানি হাসি ফুটিয়া উঠিল, ম্লান হাসি, সপ্তমীর চন্দ্রের হাসি।

বিভাস বলিলেন, তোমাকে উটি পেয়ে বসেছে দেখছি। দরোয়ান বেটাদের ব'লে দিতে হবে—

সরযূ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, ঐটুকু আর বাকী থাকে কেন? এমনি ত অতিথি ভিখারী ঢুকতে দেয় না, মনিবের হুকুম পেলে রাস্তায় গিয়ে মার ধোর করবে! আহা কি সুখের সংসার আমার! ভিখিরীকে

এক মুঠো চাল, তাও—বলিতে বলিতে সরযূ কাঁদিয়া ফেলিল, গলা দিয়া আর একটি শব্দও বাহির হইল না।

বিভাস সাহেব অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, স্নানের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে পলায়ন করিলেন।

খানিক বাদে সরকার ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, বারখানা কম্বল কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার জন্য একখানি কিনিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী লন নাই। সরকার মহাশয় বলিতে লাগিলেন, এই দারুণ শীত, খালি পায়ে ঘোরেন, কত বললুম, কম্বলখানা নিতে, কিছুতেই নিলেন না মা!

সরযূ চুপ করিয়া শুনিল। সরকার মহাশয় বিদায় লইলে, অশ্রু সম্বরণ করা অসাধ্য বুঝিয়া উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মেয়েদের খবরের কাগজ পড়ার একটা নিজস্ব ধারা আছে—পুরুষের সঙ্গে তাহার মিল নাই। সচরাচর তাহারা শিরো-লিপিতেই সন্তুষ্ট, তবে নারী-সমিতি, নারী-সভা অথবা নারী সম্পর্কিত সংবাদগুলির প্রতি আগ্রহ পুরুষের অপেক্ষা অল্প না হইতেও পারে। একদিন সকালে কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ "ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাণ্ড" এই শিরোলিপি দেখিয়া সংবাদটার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া পারিল না এবং পড়া শেষ হইলে ঘৃণায়, লজ্জায় ও শঙ্কায় মনটা এমনই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দিকে চাহিতে বা কোন কাজে মন দিতেও পারিল না। ব্যাপারটা বীভৎস! এক সন্ন্যাসী কোন গৃহস্থের গৃহে প্রতি রবিবার মুষ্টিভিক্ষা আনিতে যাইতেন। বাড়ীতে এক বৃদ্ধা ও তাহার উদ্ভিন্ন যৌবনা কন্যা থাকিত—কন্যাটি স্বামী পরিত্যক্তা, বৃদ্ধা মাতার কাছেই থাকে। একদিন

সন্ন্যাসী মেয়েটিকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। ছয় মাস অনুসন্ধানের পর পুলিস তাহাকে ধরিয়াছে; আদালতে মোকদ্দমার সময় মেয়েটি বলিয়াছে—সে সন্তান-সম্ভাবিতা এবং—

বিভাস সাহেবের বাথরুমে ঢুকিবার সময়, বেয়ারা রাজ্যের সংবাদ-পত্র রাখিয়া আসিত; সেইটুকু সময়ে তিনি পৃথিবীটার খবরদারী করিয়া ফেলিতেন। আজও বেয়ারা কাগজ লইতে আসিল, যে-কাগজে ঐ খবরটা ছিল, সরযূ সে কাগজ বাদে অন্য সবগুলাই দিল। কেন যে সরযূ এই সংবাদটা তাঁহাকে জানিতে দিতে চাহে না, তাহার কারণটা তাহার মনেও খুব স্পষ্ট ছিল না।

সেদিনটা সরযূর কি বিশ্রীই লাগিল; দুপুরের আহার বিশ্রাম পর্য্যন্ত বিস্বাদ হইয়া গেল। মনকে সে কত রকমে কতই বুঝাইল যে একজন সন্ন্যাসী পাপাচার করিয়াছে বলিয়াই যে সন্ন্যাসী মাত্রেই পাষণ্ড, ইহা কখনই হইতে পারে না। ভদ্রঘরের কোন কোন কুলকামিনী স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সমস্ত নারীই কুলটা এ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা কে রাখে?

অপরাহ্নে আদালত হইতে ফিরিয়াই বিভাস সাহেব বেয়ারাকে বলিলেন, আজকের 'পত্রিকা' আসে নাই?

বেয়ারা সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও পত্রিকা পাইল না; অথচ সরকার মহাশয়ের খাতায় নির্ভুল লিখিত আছে, দৈনিক যে কয় খানি কাগজ আসিয়া থাকে, সকলগুলিই আসিয়াছে। যখন পাওয়া যাইতেছে না, এবং সাহেব খুঁজিতেছেন, তখনই বাজারে লোক পাঠাইয়া পত্রিকা হাজির করা হইল। সাহেব বার লাইব্রেরীতে সংবাদ পাঠ

করিয়া আসিয়াছিলেন, পত্রিকার নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলিয়া সরযূকে পড়িতে দিলেন। বারম্বার অধীত সংবাদ পুনরায় সরযূ নিবিষ্ট মনে পাঠ করিল; কিন্তু কাগজ খানাকে তখনই চোখের উপর হইতে সরাইতে পারিল না। ভয় হইতেছিল তাহার মুখটা বিকৃত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং স্বামীকেও তাহা দেখান যাইতে পারে না।

সাহেব চায়ের বাটী খালি করিয়া, প্রশ্ন করিলেন, পড়লে?

সরযূ কাগজ আড়াল রাখিয়াই বলিল, হুঁ।

—দেখলে বেটাদের কাণ্ড!

পাছে তিনি আরও কিছু বলিয়া ফেলেন, সরযূ তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, তারকেশ্বরের সেই যে একজন মোহান্ত ছিল, কি ভাল তার নামটা—

সাহেব বলিলেন, সব বেটাই সমান।

সরযূ আস্তে আস্তে বলিল, ভাল মন্দ সব তাতেই আছে। গেরুয়া পরলেই যে মানুষ দেবতা হয়ে যায়, তা'ও নয়; আবার ভদ্রলোক-মাত্রই যে ভদ্রলোক, তা'ও ত নয়!

সাহেব মনে মনে হাসিলেন; বলিলেন, সে ত নিশ্চয়ই।

সে কথার শেষ ঐখানেই হইল বটে, কিন্তু কয়েকদিন পর্য্যন্ত সরযূর বুকের কোন একটা স্থানে যেন একটা কাঁটাফোটার বেদনা খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

ভীষণ শীত পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, কলিকাতা সহরে পাঁচ দশ বৎসরের মধ্যে এমন শীত আর পড়ে নাই! মধ্যাহ্ন বেলাতেও ঘরের ভিতর বসা বা শোওয়া যায় না, রৌদ্রে চেয়ার টানিয়া অথবা শয্যা

পাতিয়া বসিতে কিম্বা শুইতে হয়। আহারাদি শেষে, চতুষ্কোণ বারান্দা-টায় আরাম কেদারায় বসিয়া সরযূ একখানা কেতাব পড়িতেছিল, মেয়ে বারান্দার রেলিং ধরিয়া রাস্তার লোক চলাচল, ফেরিওলাদের আনাগোনা দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে এটা ডাকে, ওটা খাব করিয়া আব্দার করিতে করিতে এই মাত্র 'সেলাই বোরোস্' খাইতে চাহিয়া, মায়ের কাছে ধমক খাইয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ মা'র জানুতে ঠেলা দিয়া—মা দেখ, মা দেখ করিয়া মা'কে চকিত করিয়া তুলিল। নীচের পথ দিয়া সন্ন্যাসী যাইতেছিলেন। এক ঝলক রক্ত উঠিয়া পলকের জন্য মুখ খানা সরযূর রাঙা হইয়া উঠিল; সমস্ত মন বিমুখ হইয়া পড়িল।

—মা, ডাকি? ডাকি?

মা অন্যমনস্কভাবে বলিল, ডাক্।

মেয়ে ডাকিল, সন্নিসি-মামা, সন্নিসি-মামা।

সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ততক্ষণে সরযূও রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। সন্ন্যাসীর সদা প্রফুল্ল আনন, হাস্যে উদ্ভাসিত, কহিলেন, মা, আসবো? হঠাৎ সূর্য্যোদয়ে কুয়াশা যেমন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় সেই হাসি হাসি মুখ দেখিবামাত্র সরযূর সারা আকাশের আঁধারও নিমিষে কাটিয়া গেল।

—আসুন।—বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিবার জন্য সরযূ বারান্দা হইতে সরিয়া আসিল। চাকর সিঁড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, সন্ন্যাসী উপরে আসিতেই সিঁড়ির মুখে সরযূর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সরযূ নমস্কার করিয়া বলিল, আসুন।

শ্বেত ও কৃষ্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরে হলের মেঝে মণ্ডিত। সন্ন্যাসী একবার

সেদিকে চাহিয়া, পরে নিজের ধূলিধূসরিত পা দু'খানির প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া কহিলেন, আমি এই খানেই বসি মা!

—না, না, ওখানে বসবেন কি!—বলিয়া এই ধনবানের স্ত্রীটি এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। যে সুচিক্কণ ডুরে কাপড়খানি পরিয়াছিল, তাহার অঞ্চল দিয়া মার্ব্বেল পাথরের মেঝেটি মুছিতে মুছিতে বলিল, আসুন, বসুন।

মেয়েটি মায়ের পাশে মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, আসুন, বসুন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, আমারই ভুল হয়েছিল মা। মা কি সন্তানের পায়ের ধূলোর বিচার করেন?

সরযূ বলিল, আজ এত বেলা?

—কত বেজেছে? ১টার বেশী হয়েছে কি?

ঘরের দেওয়ালে প্রকাণ্ড ঘড়ি, সরযূ বলিল, ১টা বেজে দশ মিনিট।

—তবে আর বেলা কোথায়? দু'টোর আগে প্রায় ফেরা হয় না।

সরযূ সন্ন্যাসীর থলির পানে চাহিয়া বলিল, আজ যে থলি খালি, ঠাকুর?

সন্ন্যাসীর মুখে সেই হাসি। বলিলেন, আজ আমাদের দুর্ভাগ্য, আশ্রমে অতিথির পদার্পণ হয় নি মা; একজনের মত সংগ্রহ এতে আছে।

সরযূ বলিল, গিয়ে যদি দেখেন, অতিথি এসেছেন, তাহ'লে কি করবেন?

—নারায়ণের সেবা এইতেই হবে।

—আর আপনার?

সন্ন্যাসী এবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, মা, আশ্রমে আমলকি-খণ্ডের ত অভাব নেই, হরিতকী—

সরযূ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিল না, অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, তার মানে আপনার খাওয়া হবে না ? এই তো ?

সন্ন্যাসী গম্ভীর মুখে কহিলেন, অন্নপূর্ণার রাজ্যে সে রকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটে মা। অতিথি যাঁরা আসবার, সকালেই আসেন।

সরযূ বলিল, তা কি বলা যায় ? এই ত আমরাও দেখি, হাঁড়ী হেঁসেল উঠে গেছে, হঠাৎ আত্মীয় স্বজনরা এসে পড়লেন।

সন্ন্যাসী হাসিতেছিলেন ; বলিলেন, সে আত্মীয় স্বজনরা জানেন, অন্নপূর্ণার পাকশালে অন্ন সদা বিরাজিতা। আমাদের দরিদ্রের আশ্রম, অসময়ে বড় কেউ আসেন না, এলেও বঞ্চিত হতে হয় না, কারণ বললুম ত মা, অন্নপূর্ণার রাজত্ব, অন্ন কত আকার ধরেই ত বিক্ষিপ্ত রয়েছে।

সরযূর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল ; অতিকষ্টে কহিল, তার মানে সেই আমলকী, না-হয় হর্তুকী, এই তো !—সত্য সত্যই কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী তাহা দেখিলেন, হাসি তাঁহার উড়িয়া গেল, বলিলেন, করুণাময়ি ! যে বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে করুণার এই জাগ্রত প্রতিমা, সে দেশে নিরন্ন থাকবার উপায় কি মা !

সরযূ চোখের জলটা সামলাইয়া-ফেলিয়াছিল, বলিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, রাগ করবেন না ?

সন্ন্যাসী বিনয়নম্রমধুর কণ্ঠে কহিলেন, সন্ন্যাসীর যে রাগ করতে নেই মা।

সরযূ বলিল, আমি সন্ন্যাস টন্ন্যাসের কিছু জানি নে, তবে শুনেছি, যে যত বেশী কষ্ট করতে পারে, সে নাকি তত বড় সন্ন্যাসী হয় ?

—বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ মা, জবাব দেওয়া সহজ নয়।

—কঠিন কেন ?

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীর আবার বড় ছোট আছে না কি মা ? কই, আমরা ত সে জানি নে। আর, কষ্টের কথা যদি বল, সে ত মনের বিকার মাত্র। এই আমাকেই দেখ না মা, শীতের চোটে মাথায় একটা প্রচণ্ড পাগড়ী বাঁধতে হয়েছে, গায়ে এই পুরু চাদর, তবুও মনে হচ্ছে যেন শীত করছে ; আর তোমার ঐ মালীটাকে দেখ ত মা, খালি গায়ে দু'হাতে দু'টো জলভরা ঝাঁঝরি নিয়ে ফুলগাছে জল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি কি ভাবছ মা ওর খুব কষ্ট হচ্ছে ? আমি বলছি, একটুও না। ওর যে ঐ অভ্যাস, মা।

সরযূ চুপ করিয়া রহিল। সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন, আপনি না ব'লে তুমি তুমি করছি, কিছু মনে করো না মা। আর-সকলকেই আপনি বলা যায়, কিন্তু মা'কে তুমি না বললে মন খুঁত খুঁত করে।

সরযূ হাসিয়া কহিল, বেশ ত, তুমিই বলুন না। মাঝে মাঝে 'আপনি' বলেন দেখে আমার রাগ হয় !

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, তুমি বুঝি মনে করো, মা, আমরা কেবল কষ্ট ভোগই করি ? না, মা, তা নয়। একদিন যদি আমাদের আশ্রমে এসো মা, নিজের চোখে সব দেখে আসতে পারো। তোমার বাড়ী থেকে বেশী দূরে ত নয় মা, আসবে একদিন ?

—দেখি, যদি পারি। কিন্তু কথায় কথায় আপনার যে অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, ঠাকুর ?

—নাঃ, দেরী আর কোথায়! সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে হলেই হল।

—সূর্য্যাস্তের পরে আর খান্ না ?

—একাহারীদের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সে কাজ সেরে নিতে হয়।

—একাহারী ?

সন্ন্যাসীর মুখে সেই নির্ম্মল হাস্য—শরীর ধারণের পক্ষে সেই যথেষ্ট!

—যথেষ্ট, না আরও কিছু—বলিতে বলিতে সরযূর গলা ধরিয়া আসিল। সে মুখটা ফিরাইয়া লইল। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার মনের ভাবটা বুঝিলেন, মৃদু হাস্যে কহিলেন, তাই ব'লে এ কথা যেন মনে করো না মা, সেই একাহারটা তোমাদের মত পক্ষীর আহার! সেটা আমাদের বেশ গুরুতর রকমই হয়। অন্ততঃ তোমাদের দশ বার জনের খোরাক।

সরযূ এই ছেলে-ভুলানো গোছের কথায় রাগ করিয়া বলিল, সে ত একটি আলু বা একটি বেগুন, কি একটি কাঁচকলা দিয়েই সারতে হয়! জানি আমি।

সন্ন্যাসী নিরুত্তরে হাসিতে লাগিলেন। সরযূ বলিল, আমার ইচ্ছে করে আপনাদের আশ্রমের অতিথি সন্নিসিদের একদিন পেট ভরে খাওয়াই।

সন্ন্যাসী পুলকিত হইয়া কহিলেন, ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবে কেন জননী ? তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনের একটি দিন আমাদের ছুটির ব্যবস্থা করে দাও না মা!

—সত্যি বলছেন ?

—সন্ন্যাসীর যে মিথ্যে চিন্তা করতেও নেই মা।

—দাঁড়ান, আমি আসছি, বলিয়া সরযূ উঠিয়া গেল। তাহার মেয়েটি সন্ন্যাসীর থলি হইতে একটি ফুলকপির কর্ত্তিতাংশ, দুইটা আমলকি প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল, সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, তুমি আমার কাজ বাড়াচ্ছ মা! তা হবে না, তোমাকেই গুছিয়ে দিতে হবে।

মেয়ে বলিল, এ সব কি হবে ?

—খাওয়া হবে ?

—কে খাবে ?

—যার অদৃষ্টে আছে।

সরযূ ফিরিয়া আসিতে, মেয়ে মা'কে বলিল, এ সব কে খাবে মা ?

সন্ন্যাসী কহিলেন, তোমার মেয়ে ঐ প্রশ্ন আমাকেও করেছে মা, আমি তার জবাব দিয়েছি, বোধহয় সে জবাব পছন্দ হয় নি, তাই আবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে।

সরযূ বলিল, আপনি কি জবাব দিলেন ?

—আমি বললুম, যার অদৃষ্টে আছে, সেই খাবে। কেমন, ঠিক বলি নি মা ?

সরযূ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ঠিক বলেছেন। এই নিন—বলিয়া ভাঁজকরা নোটের গুচ্ছ সন্ন্যাসীর হাতে দিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, না গুণেও বলতে পারি, অনেক বেশী আছে, মা।

—যা আছে, তাই আছে। কিন্তু আর না, দু'টো বাজে।

—কিন্তু মা —

সরযূ বলিল, ঠাকুর, আমার আর একটা কথার জবাব দেবেন ?

সন্ন্যাসী হাসিলেন ; কহিলেন, কঠিন প্রশ্ন করো না, মা, হয়তো উত্তর দিতে পারবো না।

—আপনার নামটি জানতে পারি ?

—লোকে আমাকে ভারতানন্দ বলে মা।

—না, না, আগে কি নাম ছিল, আমি সেইটে জানতে চাচ্ছি।

সন্ন্যাসী এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, মা, আগের লোকটিই যখন আর নেই, তখন তার নামটাই বা থাকবে কেমন ক'রে বলুন তো !

অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী পুনরায় সেই সম্ভ্রমবাচক 'বলুন' শব্দ ব্যবহার করিলেন। সরযূর কাণে তাহা এড়াইল না। বলিল, বলতে নেই বুঝি ?

সন্ন্যাসী নীরবে হাসিলেন।

সরযূ মেয়েকে ধমক দিয়া বলিল, কেন ও সব বার করছো লীনা ?

মেয়ে রাগ করিয়া বলিল, বা রে, তুলে দিচ্ছি ত !

সন্ন্যাসী বলিলেন, মা, মেয়ের নাম রেখেছেন লীনা ? মানে কি মা ?

সরযূ হাসিয়া বলিল, কে জানে কি মানে ! লীনা বলে ডাকি ; ভাল নাম, অমিতা।

—একেবারে বৌদ্ধযুগে চলে গেছো মা। তা হোক্, মায়ের মতই সুলক্ষণযুক্তা। আচ্ছা মা, আজ বিদায় নিই।

সরযূ নমস্কার করিয়া বলিল, আবার আসবেন।

—আসবো। কিন্তু আপনি আমাদের আশ্রম দেখতে আসবেন বলেছেন, সেটা যেন ভুলবেন না মা। নমস্কার।

—নমস্কার ঠাকুর, নমস্কার।

অমিতা মাতার অনুকরণ করিয়া বলিল, নমস্কার, ঠাকুর।

সন্ন্যাসী অমিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া, হাসিয়া বিদায় লইলেন।

মা ও মেয়ে আবার বারান্দায় রৌদ্রে আসিয়া বসিল, মেয়ে বলিল, সন্নিসি-মামা কোথায় থাকে মা?

মা বলিল, আশ্রমে থাকেন।

—সেখানে আর কে থাকে মা?

—অনেক সন্নিসি থাকেন, লীনা।

—তাঁরাও সব মামা?

সরযূ হঠাৎ কথাটার জবাব দিতে পারিল না, যেন বাধিয়া গেল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল, হ্যাঁ।

মেয়ে বলিল, কপি, কাঁচা কলা, আমলকি, চাল দিয়ে সন্নিসি-মামা কি রাঁধবে মা?

সরযূর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, বাঁচাইয়া দিল, একখানা মস্ত গাড়ী। ফটক পার হইয়া, বাগানের পাশের কাঁকর বাঁধানো রাস্তা দিয়া গাড়ী বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল।

—তোর পিসিমা এল রে!

অমিতা, পিসিমা, পিসিমা করিতে করিতে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল।

৩

শনিবার হাইকোর্ট বন্ধ, কাজ কর্ম্মও হাতে বিশেষ ছিল না। সারাদিন শুইয়া বসিয়া কাগজ পড়িয়া কাটাইয়া, বিকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া সরযূ বলিল, একটু বেরোবে?

—চল, বেরোই। ময়দানে কি একটা 'ফিটে' হচ্ছে শুনছি—চল, দেখে আসি!

সরযূ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না, না, ও ফিটে মিটে নয়—

—তবে?

—চল-না, রাস্তায় বলবো'খন।

এরূপ অবস্থায় যাহা মনে করা স্বাভাবিক, বিভাস সাহেবও তাহাই মনে করিলেন এবং বলিলেন, দোকান টোকান?

—বলছি ত, রাস্তায় গিয়ে বলবো।

—কিন্তু টাকা কড়ি নিতে হবে না ত?

সরযূ বলিল, সে আমি কি জানি।

মোড়ের কাছে আসিতেই দেখা গেল, একটা বাড়ীর ফটকের মাথায় মস্ত কাঠের ফলকে লেখা "সেবাধর্ম্ম ভারত"। সরযূ ড্রাইভারকে বলিল, ঐ বাড়ীতে চলো!

বিভাস সাইন বোর্ডটা পড়িয়া লইয়া বলিলেন, ওখানে কি করতে? না, না।

—চলো না, দেখেই আসি।

ফটক পার হইয়া একটি মন্দির, মন্দিরের পর একটি দ্বিতল অট্টালিকা, তারপর খোলা মাঠ! মন্দির দ্বার রুদ্ধ, অট্টালিকা জনশূন্য, সুতরাং গাড়ী আসিয়া খোলা মাঠের সামনে থামিল, আর রাস্তা নাই। অনেকগুলি লোক, গেরুয়া এবং অ-গেরুয়া, প্রবীণ ও নবীন, যুবক ও বালক নানাবিধ ব্যায়াম করিতেছিল, একটা গাড়ী থামিল তাহা দেখিল কিন্তু কেহ অগ্রসর হইয়াও আসিল না, কথাও কহিল না। সরযূ নামিয়া মেয়েকে নামাইল,

কাজেই বিভাসও নামিলেন। সরযূ ড্রাইভারকে বলিল, গাড়ী বাইরে রাখ গে।

একজন অতি বৃদ্ধ গোছের সন্ন্যাসী তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে, বিভাস বলিলেন, আপনাদের এ সবও আছে বুঝি ?

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যেন কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি সব ?

বিভাস বলিলেন, ঐ যে, জিমনাষ্টিক কুস্তি-টুস্তি ?

বৃদ্ধ কহিলেন, ঐগুলি নিত্যকার কার্য্য।

—অনেক ছেলে ছোকরাও ত দেখছি, ওরাও কি সন্ন্যাসী নাকি ?

—আজ্ঞে না, ওরা গৃহী। বিকালে শরীর-চর্চ্চা করতে আসে।

বিভাস মাঠটা একবার ভাল করিয়া সার্ভে করিয়া লইয়া বলিলেন, দু' তিনশ ছেলে হবে বোধ হয়।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে। কোন কোন সময়ে বেশীও হয়।

—এতো ছেলেকে কুস্তি শেখাচ্ছেন, পুলিশ কিছু বলে না ?

—খোঁজ খবর রাখে বৈ কি ! তবে উদ্দেশ্যটা অসৎ নয় বলেই বোধ করি পীড়ন বা অত্যাচার করে না।

—আপনাদের বরাত ভাল !—বিভাস সাহেব হাসিয়া সরযূকে কহিলেন, দেখা হোল ত, চলো এখন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সবিনয়ে কহিলেন, আশ্রমের ভিতরে আসবেন না ?

বিভাস বলিলেন, ভেতরে আবার কি !

বৃদ্ধ কহিলেন, এসেছেন যখন দয়া করে, দেখে যাওয়া উচিত। আসুন মা। মেয়েটির একখানি হাত ধরিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, তুমি আমার কোলে এস, মা।

মেয়ে হাত ছাড়াইয়া লইয়া মা'কে জড়াইয়া ধরিল। সরযূ হাসিয়া বলিল, ও বেশ হাঁটতে পারে; আপনি চলুন।

—আসুন, বলিয়া বৃদ্ধ অগ্রবর্ত্তী হইলেন। একটা মস্ত হল, স্কুলের ধরণে সজ্জিত। বৃদ্ধ কহিলেন, আশে পাশের বাড়ীর ছেলেরা পড়তে আসে। যাদের বাপ 'মা বাড়ীতে শিক্ষক রাখতে পারেন না, তারাই আসে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে সুবিদ্বানও আছেন। আর একটি হলে, অনেকগুলি খড়ের শয্যা বিছানো রহিয়াছে। বৃদ্ধ বুঝাইলেন, আমাদের শয্যা, মা। অন্য একটা ঘরে রাশিকৃত পুস্তক, পুঁথি প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে। বৃদ্ধ সুবক্তা, কহিলেন, বহু দুর্লভ ও অমূল্য গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করা হয়েছে মা, যাঁরা পড়তে চান, এসে এইখানে বসে পড়েন। পাকশালা, ভোজনকক্ষ, গোশালা সমস্তই দেখাইয়া, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কহিলেন, ওপরে যাবেন কি মা?

—চলুন, দেখে আসি। ওপরে কি আছে?

—খালি চারখানি ঘর পড়ে আছে মা। অতিথি এলে তাঁরা থাকেন।

নীচে আসিতে, সন্ধ্যা হইয়া গেল। এখানে ওখানে দুই চারিজন সন্ন্যাসীকে দেখা যাইতে লাগিল; কিন্তু সরযূ যাঁহাকে একান্তমনে খুঁজিতেছে, তাঁহাকে দেখা গেল না। তাঁহার নামটি খুবই মনে আছে; কিন্তু কেন জানে-না কিসের একটা সঙ্কোচ ভরে তাঁহার নাম ধরিয়া খোঁজ করিতেও বাধিতে লাগিল।

বিভাস এ সকলের মধ্যে মাধুর্য্য বা বৈচিত্র্য কিছুই পাইতেছিলেন না, উপরন্তু মনটি পড়িয়াছিল, ময়দানের সেই ফিটে না-কি তাহারই উপর, বলিলেন, হোল ত, চলো এইবার।

সরযূ প্রতিবাদ করিল না। ধীরে ধীরে তাঁহার সঙ্গে চলিতে লাগিল। এমন সময়ে করতাল, কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনি উঠিল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন, বলিলেন, মা, আরতি না দেখেই যাবেন?

এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন, এমন হিন্দু বঙ্গ-রমণী আজও বিরল। ঐ বাদ্যের সঙ্গে বঙ্গ-ললনার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের কোন একটি তারে এমনই ঝঙ্কার উত্থিত হয় যে অবহেলার সাধ্য থাকে না। সরযূ ব্যগ্রস্বরে কহিল, চলুন, দেখেই যাই। বেশী দেরী হবে না ত?

সন্ন্যাসী বোধকরি একান্ত অনাবশ্যক বলিয়াই এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। সরযূ নিম্নকণ্ঠে স্বামীকে বলিল, আরতি দেখে যাই, কেমন?

বিভাস হাঁ না কিছুই বলিলেন না, যেমন চলিতেছিলেন, তেমনই চলিতে লাগিলেন। আয়োজন বিরাট নয়, অত্যন্ত সামান্য। উচ্চবেদীর উপরে জটাজুটধারী, গৈরিক পরিহিত এক সন্ন্যাসীর চিত্র—গাঁদা ফুলের মালা ছবিখানিকে বেষ্টন করিয়া আছে। পাদনিম্নে বসিয়া একজন সন্ন্যাসী পঞ্চপ্রদীপ লইয়া আরতি করিতেছেন; কয়েকজনে করতাল, কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতেছে; আর কয়েকজন অবোধ্যভাষায় কোন মন্ত্র বা স্তব পাঠ করিতেছেন।

আয়োজন যত সামান্য ও নগণ্য হোক্ না কেন, এই দৃশ্যের সম্মুখীন হইবামাত্র বাঙালীর মেয়ের হাত জোড় হইয়া আসে এবং ফল্গু নদীর বালুর ভিতরকার অদৃশ্য বারিরাশির মত অজ্ঞাত স্থান হইতে ভক্তিও উৎসাকারে উৎসারিত হইতে থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হয় না।

আরতি শেষ হইবামাত্র, একজন সন্ন্যাসী দুই হাতে দুইখানি চেয়ার

আনিয়া সরযূকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বসুন মা। পরে বিভাসের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিল, একটু বসুন।

সরযূ মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বসিল; অগত্যা বিভাসও বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, আপনাদের মন্দিরে ঠাকুর টাকুর নেই বুঝি?

সন্ন্যাসী হাসিমুখে মাল্যবিমণ্ডিত প্রতিকৃতিটির পানে চাহিল, কথা কহিল না।

বিভাস বলিলেন, পূজো আরতি এই সব যদি করতেই হয়, ঠাকুর টাকুরের করাই ত ভাল। মানুষের পূজো ক'রে লাভ কি!

সন্ন্যাসীটি এ কথার উত্তরেও একটুখানি হাসিল, কথা কহিল না। কিন্তু আর একজন কে বলিয়া উঠিল, মানুষের পূজো কে না ক'রে বলুন? আফিসে যাঁরা চাকরী করেন, তাঁরা উপরওলার পূজো করেন; উকীল বাবুরা হাকিমের পূজো করেন; ব্যারিষ্টার সাহেব জজ-সাহেবের পূজো করেন; সতী পতি-পূজা করেন। এঁরা কেউই অ-মানুষও নন্, মনুষ্যাতিরিক্তও কিছু নয়। দোষ কি কেবল আমাদেরই, আমরা গুরু-পূজা করি ব'লে?

কথাগুলা অসত্য নয়, বেঠিকও নয়, কিন্তু এমন একটা খোঁচার ভাব ছিল যে মনে মনে বিচলিত হইতে হয়, বিরক্তিও আসে। বিভাস মুখটা ফিরাইয়া দেখিলেন, বক্তা সন্ন্যাসী নয়; তবে চেহারার শুষ্কতা ও শীর্ণতা দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে সন্ন্যাসে তাহার অনুরাগের প্রাবল্য আছে। বিভাস আর কিছু না বলিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। সরযূ স্বামীর মনোভাব বুঝিল, তিনি যে ক্ষুণ্ন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ

ছিল না। তাই কথার সূত্রটা ধরিয়া বলিল, সব মন্দিরে ত দেখেছি, ঠাকুরই থাকেন।

সেই লোকটিই বলিল, উনিই আমাদের ঠাকুর।

সরযূ বলিল, আপনারা অন্য ঠাকুর দেবতা মানেন না নাকি?

সেই লোকটি কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাকে সে সুযোগ না দিয়া, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিনয় ও সম্ভ্রমযুক্তস্বরে বলিল, উনি আমাদের গুরুদেব।

—অন্য দেবতা—

—"না, এ জন্মে ঐ ঠাকুরের পূজো করছি, পরজন্মে ভাগ্যে যদি থাকে, অন্য ঠাকুরের পূজো হতেও পারে।" সন্ন্যাসী নয়, আবার সেই লোকটিই এই জবাব দিল। বিভাস কহিলেন, তার মানে?

লোকটি তাহার সেই কাটা-ছাঁটা ভাবে বলিল, মানেটা কি জানেন? এম্-এ পাস করবার আগে বি-এ পাশটা যেমন না করলেই নয়, এ'ও তাই। বাড়ীর এক তলাটায় পা না ঠেকিয়ে দোতলা, তেতলায় ওঠা যায় কি-না আপনিই বলুন না!

বিভাস চুপ করিয়া গেলেন। এই লোকটির সঙ্গে কথা কহিতে যেন প্রবৃত্তিই হয় না। কতকগুলা লোকের স্বভাব আছে তাহারা কারণে নয়, অকারণেও লোককে ঠোক্কর দিয়া কথা বলে। এই লোকটি সেই শ্রেণীর। আরও দুইজন সন্ন্যাসী সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সরযূ তাঁহাদের উদ্দেশে বলিল, আরতি দেখে তৃপ্তি বিশ্বেশ্বরের।

সন্ন্যাসী প্রশান্ত হাস্যে কহিল, তিনি যে মা, বিশ্বের ঈশ্বর।

নারীসুলভ চাপল্যবশতঃ সরযূ বলিল, আপনারাও কেন, তেমনি করেন না? দেখতে ত ভালই হয়।

—তা হয় কিন্তু আমরা কাকে দেখাব মা? আমাদের আরতির যে আমরাই দর্শক। দরিদ্রের দেবতা, অত্যন্ত অল্পেই তুষ্ট।

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবামাত্র সেই লোকটি গায়ে পড়া হইয়া বলিয়া উঠিল, হাজার হাজার লোক দেখতে আসবে, ঝন ঝনাৎশব্দে প্রণামী পড়বার সম্ভাবনা থাকলে পূজা-আরতির আয়োজনও বাড়ে, শোভাও বৃদ্ধি পায়।

কথাটা সরযূকে আঘাত করিল; বোধ করি বা হিন্দুনারী মাত্রই ঐ কথায় অন্তরে ক্লেশ অনুভব করিবে। ব্যথিতস্বরে কহিল, আপনি বলছেন, বিশ্বেশ্বরের আরতিটা দোকানদারী?

কথাটার জবাব পাইবার সুযোগ হইল না। একজন সন্ন্যাসী ক্ষুদ্র একখানি থালা হাতে নাটমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সরযূ চিনিল, সন্ন্যাসীর মুখও হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনিই ভারতানন্দ। সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া বলিলেন, মা, প্রসাদ গ্রহণ করুন।—বলিয়া থালা হইতে দুই চারিটি কিস্‌মিস্ দানা তুলিয়া সরযূর হাতে দিলেন। সরযূর মেয়েটিকে কহিলেন, তুমি হাত পাতো ত মা! মেয়ে হাত পাতে না, সরযূ ইঙ্গিত করিতে, মেয়ে হাত পাতিল। তারপর বিভাসের নিকটে আসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, আপনাকেও একটু নিতে হবে। সরযূ আগ্রহভরা দু'টি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বিভাস হাতটা পাতিয়া কিস্‌মিস্ দানা কয়টি লইল বটে, কিন্তু মুখে দিল না; হাতেই রাখিয়া দিল—বাহিরে গিয়া ফেলিয়া দিবে ইহাই ইচ্ছা।

নাটমন্দিরের এক দিকে অনেকগুলি সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রসাদ বিতরণের উদ্দেশ্যে সেইদিকে যাইতে যাইতে, ফিরিয়া আসিয়া ভারতানন্দ সরযূকে বলিলেন, যাবেন না মা, আমি আসছি।

স্বামী যে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, সরযূ তাহা বুঝিয়াই বলিল, দেরী করবেন না কিন্তু।

ভারতানন্দ হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

বিভাস কহিলেন, চলো।

—চলো, বলিয়াও সরযূ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। বিভাস বলিলেন, আর কেন, চলো-না!

তাঁহারা বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। জুতা পরিতেছেন, ভারতানন্দ সরযূর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, মা, অতিথি সন্ন্যাসী সকলেই আজ পরম তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করেছেন।

সরযূ মুখ তুলিয়া একটু হাসিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, হিসেবটা এখনও হয়নি, তবে অনেকগুলো টাকা বেঁচেছে তা জানি। বোধ হয় টাকা ত্রিশ হবে।

সরযূ হাসিয়া কহিল, টাকা ত মোটে পঞ্চাশটি, তার ত্রিশ টাকাই যদি বাঁচলো, তবে কি রকম খাওয়ালেন, ঠাকুর?

সন্ন্যাসী কহিলেন, মা, তোমার পুণ্যে অন্যদিনের তিনগুণ অতিথির সমাগম হয়েছিল আজ; আমরাও কম লোক নেই-মা; সকলেই পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করেছেন। হিসেব ক'রে টাকাটা কাল সকালের দিকেই দিয়ে আসবো।

—না, না, দিয়ে আসতে হবে না। ওটা দিয়ে আর একদিন সকলকে—

সন্ন্যাসী বাধা দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, মা অন্নপূর্ণা, সন্তান-স্নেহে অন্ধ

হ'য়ে তাদের আলস্যের প্রশ্রয় দেবেন না। বাকীটা কালই দিয়ে আসবো।

—এত তাড়া কেন ঠাকুর ?

—কাল রাত্রেই আমাকে কুম্ভে যেতে হবে মা, আর ত সময় পাবো না, তাই কাল—

সরযূ বলিল, কোথায় যাবেন বললেন ?

-কুম্ভে।

সরযূ কথাটা ঠিক বুঝিল না ; বলিল, কবে ফিরবেন ?

ভারতানন্দ হাসিয়া বলিলেন, এযে ভোগের আগেই প্রসাদ ভক্ষণের মত কথা হোল মা। আগে যাই, তারপর ত ফেরার কথা।

বিভাস অল্পদূরে দাঁড়াইয়া আর একজন সন্ন্যাসীর সহিত পথি-পার্শ্বস্থ ফুল-লতা-পাতার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, বলিলেন, দেরী করছো কেন, এসো।

—এই যে আসি। আচ্ছা ঠাকুর, চললুম। কাল কখন আসছেন ?

—সকালের দিকেই আসবো মা।

গাড়ীতে উঠিয়া, সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলে বলো ?

বিভাস অবজ্ঞাভরে কহিলেন, যতো বাজে !

অন্ধকারে বিভাস দেখিতে পাইলেন না, কথাটা সরযূকে কতখানি আঘাত করিল। সরযূর অনেক কিছু বলিবার ছিল, আলোচনা করিবার ছিল, জিজ্ঞাসার ছিল, এই রূঢ় বাক্যে মনের ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। সারা পথ কেহ কোন কথাই কহিল না।

ভারতানন্দ আসিলেন না। একটি অল্প বয়স্ক সন্ন্যাসী গেটের নিকটে

বাড়ীর সরকার মহাশয়কে পাইয়া, তাঁহার হাতে একত্রিশ টাকা বারো আনা পয়সা দিয়া, মা'কে দিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। সরকারকে সরযূ ধমক দিয়া বলিল, তাঁকে ডেকে আনলেন না কেন! জানেন ত আপনি, তিনি বরাবর ভেতরেই আসেন।

—তিনি ন'ন মা, অন্য একজন সন্ন্যাসী।

—তিনি ন'ন? ঠিক জানেন?

সরকার বলিল, ঠিক জানি মা, তিনি ন'ন।

সরকার চলিয়া যাইতেছিল, সরযূ ডাকিয়া বলিল, কিন্তু তিনি নিজেই আসবেন বলেছিলেন আমাকে। আপনি চিনতে ভুল করেন নি ত!

সরকার বলিল, না মা, ভুল করবো কেন! তাঁকে নিয়ে সেদিন বড়বাজারে কম্বল কিনতে গেলুম, অতোক্ষণ একসঙ্গে রইলুম, কত কথা কইলুম। তাঁকে চিনতে পারবো না!

সরযূ আর কিছু বলিল না; ম্লানমুখে অন্যত্র চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কি বা কথা তাহার ছিল, কটা কথাই বা হইত, তা নয়; কিন্তু সরযূর মনে হইল, সকালটা সে শুধু সেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীটির দর্শন কামনা করিয়াই পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। তিনি না আসায় তাহার হতাশার পরিমাপ করিবার শক্তিও তাহার ছিল না বটে, তবে সমস্ত সকালটা এক মুহূর্ত্তে একেবারে বিবর্ণ বিস্বাদ হইয়া গেল।

৪

আর একটা ছুটির বার। বিভাস সাহেব সর্ব্বাঙ্গে খান দুই মোটা র‍্যাগ চাপাইয়া দিয়া দিবা-নিদ্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন,

সরযূ বড় খাটের উপর মেয়েকে ছবির বই পড়াইতেছিল, হঠাৎ এক সময়ে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, হ্যাঁগা, কুম্ভ মানে কি বলত ?

বিভাস বলিলেন, কুম্ভ ? কুম্ভ ? কুমীর টুমীর হবে বোধ হয়।

সরযূ হাসিয়া বলিল, সে ত কুম্ভীর। আমি বলছি কুম্ভ মেলাটা কি !

—একটা একজিবিসন টেকজিবিসন হবে ! বলিয়া বিভাস র‍্যাগ দিয়া মুখ ঢাকিলেন।

মেয়ে বসিয়া ছবি দেখিতেছিল, ক্রমে কাৎ হইল, তাহার পরে শুইয়া ছবি দেখিতে লাগিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। সরযূ স্বামীর খাটের উপরে পতিত ইংরাজী সংবাদপত্রখানি টানিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। কোনও সংবাদের উপরই তাহার কিছু-মাত্র আগ্রহ আছে বলিয়া মনে হয় না ; সে শুধু শিরোনামা গুলিই পড়িয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ একটা স্থানে আসিয়া সংবাদে মগ্ন হইয়া গেল—হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। পঁচিশ লক্ষ লোক সমাগম। গবর্ণমেণ্টের প্রশংস-নীয় কার্য্য। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সেবাকার্য্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ।

সংবাদটি বার দুই তিন পড়িয়া স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিল, তিনি অকাতরে নিদ্রিত। একবার ইচ্ছা হইল, ঠেলাঠেলি করিয়া জাগাইয়া দেয়। কিন্তু, কাঁচা ঘুম ভাঙানোর ফলে মেজাজটি কিরূপ ধারণ করিবে তাহা জানা ছিল বলিয়াই নিরস্ত হইয়া আবার সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিল। "কোর্ট সার্কুলারে" আসিয়া চক্ষু নিবদ্ধ হইল। আগামী ২৩শে জানুয়ারী বড়লাট ও বড়লাট-পত্নী হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যোগদান করিবার জন্য নয়াদিল্লী ত্যাগ করিবেন। ইহার পরে ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব নয়,

সরযূ ভবিষ্যৎকে নস্যাৎ করিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিয়া গেল। বিভাস উঁ অঁা, আঃ, কি কর, ইত্যাদি প্রভৃতি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত মুখের আবরণ মোচন করিলেন।

—চল না, হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখে আসি!

—কোথায়? কি মেলা?

—কুম্ভমেলা, হরিদ্বারে!

—কুম্ভ মেলা! ছো! ছো!! সে সব ভয়ানক নোংরা ব্যাপার!

—নোংরা ব্যাপার?

বিভাস গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ভীষণ নোংরা ব্যাপার! ভদ্রলোকে যায় সে সব দেখতে! ছো! ছো!!

সরযূ মনে মনে হাসিতেছিল, বাহিরে সে ভাব অপ্রকাশ রাখিয়া কহিল, তুমি ত যাওনি কখনও, কুম্ভ মানে কি তা'ও জানো না, অথচ ভীষণ নোংরা ব্যাপার বলছো! জানলে কি ক'রে নোংরা ব্যাপার!

বিভাস বলিলেন, আরে, আমাদের বার লাইব্রেরীতে কথা হয় যে!

—কি কথা হয়?

—ঐ সব, আর কি! ভদ্রলোকেরা ঐ সব মেলা টেলায় যায় না—সবাই জানে!

সরযূ মিটি মিটি হাসিতেছিল; বিভাস তাহা দেখিয়া বলিলেন, ঐ সন্নিসিগুলো বলেছে বুঝি? বলেছি ত ওগুলো তোমায় পেয়ে বসেছে। যতো সব বাজে!

সরযূ সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, আচ্ছা, এখন ভারতের বড়লাট কে বলো ত?

—কেন, লর্ড লিংলিথগো।

—আচ্ছা, তিনি কি রকম লোক বল ত?

—তার মানে?

সরযূ গম্ভীর হইয়া বলিল, তিনি লোক কেমন? ভদ্রলোক, না ছোটলোক?

বিভাস জিভ কাটিয়া বলিলেন, ছি! ছি!! বড়লাটরা খুব বড় ও সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকই হয়ে থাকেন! বিশেষ ক'রে ইনি খুব ভদ্রলোক। বোধহয় লর্ড আরুইনের পরে—

সরযূ বলিল, লর্ড আরুইন্ আপাততঃ মাথায় থাকুন। ইনি ভদ্রলোক ত?

—নিশ্চয়ই।

—এঁর স্ত্রী?

—তিনিও খুব ভদ্র। আমাদের দেশের যক্ষ্মা নিবারণ করবার জন্যে কি পরিশ্রমটাই না করছেন।

সরযূ বলিল, কুম্ভমেলায় ভদ্রলোক যায় না, তোমাদের হতচ্ছাড়া বার লাইব্রেরীর যদি এই মত, বড়লাট ও তাঁর স্ত্রী হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখতে যাচ্ছেন কেন?

বিভাস উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, পাগল না ক্ষেপা! তাঁরা যাবেন ঐ সব ন্যাষ্টি নিগার্ডলি শো'তে! ভুজুং, ভুজুং, সন্নিসিগুলো তোমায় ভুজুং দিয়েছে। কাল সন্ধ্যেবেলা গলিটায় দাঁড়িয়ে ঐ সব বলছিল বুঝি?

সরযূ হাসিয়া বলিল, না, সে বেচারা হয় ত এতো সব জানেও না; তোমাদের কাছে যার কথা বেদবাক্য, বাইবেল, কোরাণের বাক্য—এ

সেই ষ্টেট্‌সম্যানের খবর, পড়ে দেখো—বলিয়া সেই স্থানটা দেখাইয়া দিল। বিভাস পড়িলেন। এবং পড়িতে পড়িতে তাঁহার তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল।

সরযূ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, খবরটা ভুল, না বড়লাট সাহেব ও তাঁর স্ত্রীটি ছোটলোক, এখন কি বলতে চাও, তাই বল ?

সুবুদ্ধিবিভাস হাসিয়া বলিলেন, তাঁরা রগড় দেখতে যাচ্ছেন, এটা আর বুঝলে না ?

সরযূ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিল, বুঝলুম না আবার, খুব বুঝলুম ! আমরাও ঐ রগড় দেখতেই যাবো, এও বুঝলুম।

বিভাস এমন জোরে একটা হাস্য করিয়া উঠিলেন যে তাহার দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে কথাটা কেবলমাত্র হাসিয়া উড়াইয়া দিবারই মত।

বয় পাশের ঘরে চায়ের টেবিল সাজাইয়া আসিয়া খবর দিল যে, চা টেবল্'পর এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা সংবাদ দিল যে ব্যানার্জ্জি সাহেব আসিয়াছেন। তাঁহাকে চায়ের টেবিলে আনিতে নির্দ্দেশ দিয়া বিভাস হাত মুখ ধুইতে বাথ রুমে প্রবেশ করিলেন। ব্যানার্জ্জি সাহেব তাঁহার জুনিয়র।

পরদিন বার লাইব্রেরীতে শুনা গেল, বারের লীডার সরকার সাহেব গতরাত্রে হরিদ্বার যাত্রা করিয়াছেন ; সঙ্গে মাতা, পত্নী, দুহিতা, পুত্র প্রভৃতিও আছেন। সরকার সাহেব খাঁটি সাহেব। বছরে একবার, কখনও দুইবার সমুদ্র-পথেই হোক্, বায়ুরথেই হোক্, হোম্ পরিদর্শন করিয়া আসেন। ডেভনে তাঁহার গৃহখানি বহু ইংরাজেরও লোভের এবং ঈর্ষ্যার উদ্রেক করে। এহেন সরকার সাহেব সপরিবারে কুম্ভমেলায় পুণ্য সঞ্চয়

করিতে গিয়াছেন শুনিয়া বার লাইব্রেরীতে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। একজন বঙ্গসাহিত্যরসিক নব্য ব্যারিষ্টার কহিলেন, প্রায় পঞ্চাশবছর আগে, কবি ডি, এল, রায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবলে এই দৃশ্য দেখেই গান লিখেছিলেন :—

ছেলে বেলায় লক্ষীর মত
পক্ষীর মাংস খান্ নি কে ?
ভবনদীর পারে গিয়ে বেড়াল
বসেছেন আহ্নিকে !

সরকার সাহেবের বেলায় পক্ষীর মাংস বদ্‌লে বৃহৎ চতুষ্পদ মাংস করা যেতে পারে !

খুব একটা হাসির হুল্লোড় উঠিল।

অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া দেখা গেল, সেইদিনের ইংরাজী সংবাদপত্র-খানির একটি সংবাদের চতুষ্পার্শ্বে লাল, নীল, বেগুণে নানা বর্ণে চিত্র বিচিত্র করিয়া তাঁহার টেবিলের মধ্যস্থলে রাখা আছে। বিভাস সাহেব টাই খোলা বন্ধ রাখিয়া সংবাদপত্রটি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন। সংযুক্ত প্রদেশের গভর্ণর সস্ত্রীক হরিদ্বারে পৌছিয়াছেন, কোর্ট সার্কুলার মারফৎ এই মহামূল্য সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে। সাহেব মনে মনে হাসিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন; সংবাদপত্রখানি হাতে লইলেন।

সরযূ বলিল, রগড় দেখবার লোক কেবলই বেড়ে যাচ্ছে, তা দেখছ ত !

বিভাস বলিলেন, তাই ত দেখছি। ভাবছি দু'শ রগড় চারশ' মজা

না দেখে আর ত থাকা যায় না। গোছ গাছ করতে লেগে যাও আর কি!

—সত্যি?

—মিথ্যে হবার যো কি। গোদ সরকার সাহেব কাল রাত্রের পাঞ্জাব মেলে রওনা হয়ে গিয়েছেন।

ব্যারিষ্টার মহলে সরকার সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অখণ্ড প্রভাব। বিভাসের কথা আরও স্বতন্ত্র, কারণ ব্যারিষ্টারীতে হাতে খড়ি দিয়াছিলেন সরকার সাহেব, বারে এই যে প্রতিষ্ঠা, তাহারও মূলে সরকার সাহেব। ব্যারিষ্টার-পত্নীর নিকট এই সকল গূঢ় তত্ত্ব অবিদিত ছিল না। সরযূর আর সবুর সহে না, বলিল, আমরা কবে যাব, আজই?

—আজ আর কি করে হবে? গাড়ী রিজার্ভ করতে হবে; থাকবার একটা জায়গাও ঠিক করা চাই। সরকার সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দোব মনে করছি, বাসা টাসা পাওয়া যাবে কি-না জানবার জন্যে।

সরযূ খানিকটা হতাশ হইয়া পড়িয়া বলিল, বাসার জন্যে অত ভাবনা চিন্তের দরকার নেই, সে যা-হয় একটা হবেই'খন।

—না, না, একটা কথা পাওয়া দরকার। আজ টেলিগ্রাম করলে কালই জবাব পাওয়া যাবে।

—তবে তাই করো, বলিয়া সরযূ তখনই তারের ফরম, কলম প্রভৃতি আনাইয়া লইল; বলিল, তাঁর ঠিকানার কি হবে?

বিভাস বলিলেন, মিঃ সরকার অফ ক্যালকাটা বার, হাড্‌ওয়ার, বলে দিলেই হবে। তাঁকে না চেনে কে?

ঠিক তাই! পরের দিন সকালেই জবাব আসিল, একটা বাড়ী ঠিক করিয়াছি, আসিতে পার।

৫

ভিড়ের মধ্যে পরেশের সঙ্গে দেখা। কতকগুলি বালক একটা বাক্সের কাঁচে চক্ষু লাগাইয়া "কলকাত্তা দেখো, কাশী দেখো, বিন্দ্রাবন দেখো" দেখিতেছিল, পরেশ তাহাদের নায়ক। বিভাস সাশ্চর্য্যে কহিল, এখানে কি করছিস্? কবে এলি? কোথায় আছিস্?

পরেশ জবাবে বলিল, এই ছেলেগুলা তাহাদের স্কুলের ছেলে, ইহা-দের অভিভাবক হইয়া তাহাকে তিন চার দিন হইল এখানে আসিতে হইয়াছে; আছে সেবাধর্ম্ম ভারতে।

পরেশ বিলাতে গিয়া গোটাকত গালভরা ডিগ্রী টিগ্রী আনিয়াছিল; ভাল চাকরী-বাকরী জুটিবার সম্ভাবনাও ছিল; সে-আশা ভরসা না করিয়া গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করিতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার বন্ধু বান্ধবরা এইটুকু সংবাদ জানিতেন। কিন্তু পরেশ যে এমন একটা গেঁইয়া ভূত হইয়া পড়িতেও পারে ইহা কল্পনা করাও যায় না। বিভাস কি আর সাধে অবাক হইয়াছিলেন? হাসিয়া বলিলেন, সেখানে কেন? সন্ন্যাসী হবারও ইচ্ছে আছে নাকি?

পরেশ "দেখো-দেখো"ওয়ালাকে পয়সা চুকাইয়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, উঁ হুঁ—বড় কষ্ট! ইচ্ছে থাকলেও পারা যাবে না। ও একটা আলাদা জাত, বুঝলে না হে বিভাস!

বিভাস হাসিয়া বলিলেন, আলাদা জাত কি রকম?

—শুনবে কি রকম? শোন, একটা দৃষ্টান্ত দোব। আশ্রমে সন্ন্যাসী নিজেরা অনেকগুলো আছে, তাছাড়া আমাদের মত অনাহুত, রবাহুত

শ দুই হবে। যে আসছে, 'আয়াহি,' না, শব্দটি নেই। অমনি থলি ঘাড়ে বেরিয়ে পড়লো মুষ্টি ভিক্ষা করতে। আমি অবাক হয়ে ভাবি যে শুধু মুষ্টি ভিক্ষায় নির্ভর ক'রে এরা দুনিয়ার অসহায়, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয় কোন্ সাহসে। তুমিই বলো, আশ্চর্য্য নয় ?

বিভাস গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমি সে কথা ভেবে আশ্চর্য্য হই নে, আমি ভাবি, এই অকর্ম্মা, নিষ্কর্ম্মা, কুঁড়েদের প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে দেশটার কি দারুণ সর্ব্বনাশ করছে ! চেহারাগুলো দেখলে সত্যিই হিংসে হয়, সাত সাতটা বাঘে খেলেও হাড় মাংস ফুরোবে না, কেমন চমৎকার পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে—

পরেশঅত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে ? বিভাস, কি বলছ হে ! এই সব আশ্রমের সন্ন্যাসীদের কাজ তুমি দেখনি নিশ্চয়ই, কিন্তু শোনওনি কি কিছু ? দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, এই সব মহাতীর্থে, মেলায়—

বিভাস থামাইয়া দিয়া বলিলেন, জানি হে, সব জানি ! একটু কিছু করতে হবে ত ! নইলে লোকে বারবার ভিক্ষেই বা দেবে কেন বল ? ঐ যে কাজ টাজ বলছ, ওগুলো হল এ্যাডভার্টিজমেণ্ট,—বিজ্ঞাপন,—বুঝলে না ! ঐ বিজ্ঞাপনের জোরেই আলস্যের এতো বড় জোর ব্যবসা চলেছে ! আচ্ছা, চললুম, আবার দেখা হবে।—বলিয়া হাসিয়া বিভাস বিদায় হইলেন।

পরেশ বিবর্ণ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে মাষ্টার মশাই ?

পরেশ কি উত্তর দিল, আদৌ দিল কি-না শুনা গেল না। কেননা,

লক্ষ খোল-করতালের ধ্বনির সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দল একটা গলি হইতে বাহির হইয়া একেবারে তাহাদের সামনেই আসিয়া পড়িয়াছিল।

আমি কুম্ভমেলার বর্ণনা করিতে বসিব না, সে ইচ্ছা আদৌ নাই। কেন নাই জানেন? শৃগাল ও অতি তিক্ত দ্রাক্ষাফলের গল্পটা যাঁহাদের স্মরণ আছে,কেবলমাত্র তাঁহারাই বুঝিবেন, অনিচ্ছার হেতুটা কি! বিরাটের কল্পনা করিতে পারি, হয়ত বা লিখিতেও পারি, কিন্তু বিরাটতম-কিছুর কাছাকাছি এমন ঠাঁইও আছে যেখানে কল্পনা হোঁচট খায়, লেখনী স্তব্ধ হইয়া পড়ে। পূর্ণ কুম্ভের বিরাটত্ব এতখানি ত বটেই, বুঝি আরও অধিক। রেল, পুণ্যকামী বহন করিয়া যেন পারিয়া উঠিতেছে না; ভাগীরথীর বুকে জল দেখা যায় না, কেবল নর-নারী-মুণ্ড; খাবারের দোকানে ঘৃত দুর্ল ভ, যা করে ভেজিটেবল প্রোডাক্ট;—ভিড় আরও বৃদ্ধি পাইলে নারিকেল তৈলাশ্রয় করা ভিন্ন উপায় নাই; ময়দায় পাথর কুচির গুড়া মিশাইয়াও মুদী আর জোগান দিতে পারিতেছে না; চালের সঙ্গে রেল লাইনের ঝামার টুকরা না মিশাইয়াই বা তাহারা করে কি! কেহ কেহ বলিতেছে, লোক এক কোটী ছাড়াইয়া গিয়াছে; কেহ বলে, না, নব্বই লক্ষের বেশী হয় নাই; খবরের কাগজ পঞ্চাশ লক্ষের হিসাব দেয়; মিউনিসিপ্যালিটি বলে, আরও বেশী; রেল কোম্পানীর বাবুরা বলে, মাঝামাঝি একটা।

সে যাহাই হোক্, সর্ব্বত্র একটা শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। শুধু যে সরকারী পুলিসই শৃঙ্খলা বিধানে সক্ষম হইয়াছে, তাহা নয়; ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশাগত বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বই সর্ব্বাধিক। বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসী-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যকলাপ লোককে বিমুগ্ধ করিয়া

ফেলিয়াছে। এমন কি বড়লাট বাহাদুরও তাহাদের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন।

সেইমাত্র নাগা সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার দুইধারের সেই জনসমুদ্র নাগাদের কথাই আলোচনা করিতেছিল। এত নাগা কোথায় থাকে ? এত ধন দৌলত, হাতী ঘোড়া, মণি মাণিক্যই বা কোথায় পায় ? হঠাৎ এক সময়ে একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল। মেয়ে চুরী ! মেয়ে চুরী ! কাহার মেয়ে, কত বড় মেয়ে, কেমন দেখিতে, বাপ মা কোথায়, কখন্ চুরী গেল, কিরূপে চুরী গেল, কেহ জানে না, কেবল চেঁচামেচি করে, ঠেলাঠেলি করে, আর বলে, কি সর্ব্বনাশ ! খবর পুলিশ শুনিল, হাসিয়া আপন কাজ করিতে লাগিল ; স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল, সামনে যাহাকে পায়, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, বলতে পারেন মশাই কার মেয়ে, কোথা থেকে—ইত্যাদি। সন্ন্যাসীরাও খবর পাইয়া ভিড়ের ভিতরে ঢুকিয়া উচ্চৈস্বরে বলিতেছেন, দয়া করে বলুন, কার মেয়ে, কত বয়স, কি নাম······

এক জায়গায় বিভাস ও সরযূকে ঘেরিয়া অনেক লোক কোলাহল করিতেছিল, ভিড় ঠেলিয়া একজন সন্ন্যাসী সম্মুখে আসিয়াই চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, মা !

সরযূর দু'টি চোখে সহস্রধারা বহিতেছিল, সরযূ কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, সন্ন্যাসী, আমার লীনা ?

সন্ন্যাসী ধীর, স্থির, নিশ্চল, আকারে প্রকারে উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার চিহ্ন মাত্র নাই। স্থির নিষ্কম্পস্বরে কহিলেন, কতক্ষণ তাকে পাওয়া যাচ্ছে না মা ?

কথার উত্তর দিবার শক্তিটুকুও সরযূর ছিল না ; বিভাস বলিলেন—সে ত বলতে পারবো না। আমাদের দু'জনের মাঝখানেই বরাবর ছিল—নাগাদের সোনার হাওদাওলা হাতী দেখে তার কি আনন্দ! হঠাৎ—

সন্ন্যাসী বলিলেন, থাক্, আর শুনে কি হবে! দেখি! বলিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কেহ কেহ বলিল বটে, সেবাধর্ম্ম ভারতের সন্নিসি ওরা, মেয়ে ঠিক খুঁজে আনবে—এ কথায় পিতামাতার মন সান্ত্বনা পায় না। অনেকে অনেক রকম উপদেশ দিয়া গেল, দুঃখ প্রকাশ করিবার লোকাভাবও হইল না ; আবার করুণা প্রদর্শন করিয়া যাইবার লোকও অনেক জুটিল।

সরকার সাহেব নিজে থানায় গিয়া দারোগাকে এমন ধমক দিলেন, দারোগাকুলে তেমন ধমক কেহ কোনদিন খাইয়াছে এ কথা দারোগা-ভারতে লেখে না। অবস্থা বিশেষে বাঘে ঘাস খায় এটা শোনা কথা, মিথ্যা হওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু দারোগা সাহেব যে গালি গালাজগুলা নিঃশব্দে হজম করিলেন, তাহা অবিকৃত সত্য। না করিয়া করেন কি? আজই সকালে ভাইসরয়ের গাড়ী হইতে খোদ ভাইসরয়ের করমর্দ্দন করিয়া বাহির হইতে এই ব্যক্তিটিকেই কি তিনি স্বচক্ষুতে দেখেন নাই?

যে পিতা বা যে মাতাকে একটিমাত্র সন্তান লইয়া সদাই শঙ্কায় ও আতঙ্কে থাকিতে হয়, সে রাত্রিটা সরযূর কেমন করিয়া কাটিল, সে শুধু তাঁহারাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবেন। সে রাত্রে আহার্য্যের কথা কাহারও মনে পড়িল না, নিদ্রা সে দিক মাড়াইতে সাহস

করিল না। সেই যে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া সরযূ বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, সারা রাত্রির মধ্যে একটি মুহূর্ত্ত আর তাহার বিরাম হইল না। সরকার সাহেব পত্নীসহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নীরবে এই দৃশ্য দেখিলেন, তারপর চোখ মুছিতে মুছিতে নিজেদের বাসায় ফিরিলেন। বিভাস সারারাত্রি পাশে বসিয়া সরযূর পিঠে হাত বুলাইয়া শোকের অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর ঝি-চাকর-দরোয়ানরাও নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

রাত আছে কি নাই, কে যেন পরিচিতকণ্ঠে ডাকিল, মা !

সরযূর কান্না বন্ধ হইল। কিন্তু বিশ্বাস হইল না, কাণ খাড়া করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

আবার ডাক আসিল, মা !

সরযূ ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিভাসকে বলিল, দেখো না গো, বাইরে কে যেন ডাকছে—মা বলে !—স্বরটা যে সন্ন্যাসীর, একথা সাহস করিয়া সে বলিতে পারিল না।

—মা !

—ওগো ! দেখ, দেখ—নিশ্চয়ই তিনি।-সরযূ টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া পাগলের মত বাহিরের দিকে ছুটিতেছিল, বিভাস তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, লক্ষ্মীটি, তুমি বোস, আমি দেখে আসছি।

যাইতে হইল না, ভৃত্যবর্গ দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে আসিতে আসিতে বলিলেন, তোমার হারানিধি নাও মা !

সরযূ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, পেয়েছ ঠাকুর, পেয়েছ ?

—এই যে মা তোমার লীনা, বলিয়া সন্ন্যাসী গাত্রাবরণ মুক্ত করিলেন, লীনা তাঁহার কাঁধের উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, মা যখন দুই হাতে প্রবল আকর্ষণ করিলেন, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, আমি মা'র কাছে যাবো।

—লীনা, লীনা, মা আমার, এই যে আমি! দেখ, দেখ—

লীনা ভয়ে কাঁপিতেছিল, চক্ষু চাহিল না। সরযূ তাহাকে কোলের উপর শোওয়াইয়া ভয় ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিভাস বলিলেন, কোথায় পেলেন সন্ন্যাসী?

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে কহিলেন, গুরু মিলিয়ে দিলেন, মা।

বিভাস বলিলেন, কতদূরে—

সন্ন্যাসী কহিলেন, প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, বেদেদের আড্ডায়। লীনার গায়ে কি কোন গয়না ছিল মা?

সরযূ শুনিতে পাইল কি-না বলা যায় না; একটা ঝি দাঁড়াইয়াছিল, সেই বলিল, গলায় একগাছি হার ছিল আর দু' হাতে দু' গাছি চুড়ী।

—সেগুলো গেছে।—বলিয়া সন্ন্যাসী সরযূকে কহিলেন, মা, ওকে একটু গরম দুধ খেতে দাও, সারা রাত কিছু খেতে ত পায়ই নি, তার ওপর এই ঠাণ্ডায় আনতে হয়েছে। না খেলে ভয়ও ভাঙবে না, কথাও বলাতে পারবে না। তারপর বিভাসের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি যাই।

বিভাস কৃতজ্ঞচিত্তে কহিলেন, আজ কোনও সময়ে কি একবার আসতে পারবেন?

—আজ যদি না-ও পারি, কাল আসবো। মা, আসি—নমস্কার, বলিয়া সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন। বাহিরের পৃথিবীর মাথার উপরে কে যেন বরফগলা জল ঢালিয়া দিয়াছে, ভোর রাত্রের স্তব্ধ আলো-আঁধারে দাঁড়াইয়া সারা পৃথিবী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতেছে।

সন্ন্যাসী সেই ঋজু, শীর্ণ দেহ লইয়া বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন, বিভাস বলিলেন, লোকটিকে দেখতে যেন ঠিক—

সরযূ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আমি জানি গো জানি! যখনই দেখি, আমার দাদাকেই মনে পড়ে। কেন আবার তুমি সে কথা মনে করিয়ে দিলে!—বলিতে বলিতে সরযূ কাঁদিয়া উঠিল। রোদন-সমুদ্রকে সে যেন অতি কষ্টে চোখের পাতার বাঁধ দিয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তে বাঁধ ভাঙিল! বাঁধ যদি ভাঙিল, তরঙ্গোচ্ছ্বাস রোধে কাহার সাধ্য! মায়ের দেখাদেখি লীনাও কাঁদিতে লাগিল।

কথাটা এই। সরযূর বড় ভাই সুরজিৎ বিলাতে এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়িতেছিল। পাস করিয়া দেশে ফিরিবার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া সেই বিদেশে, অকালে, আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত অবস্থায় তাহার জীবনাবসান ঘটে। একটা মানুষের চেহারার সহিত আর একটা মানুষের চেহারার সাদৃশ্য হওয়াটা অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। যাহাদের আত্মীয়-বিয়োগ হইয়াছে, সাদৃশ্য দেখিলে তাহাদের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়; সরযূরও হইয়াছিল। তাহার দাদার সহিত ভারতানন্দের সাদৃশ্যটা এতই সন্নিকট যে প্রথম দিন হইতেই ভারতানন্দকে দাদা বলিয়া

ডাকিয়া, তাহার সেবা করিবার জন্য তাহার ভগ্নী-হৃদয় লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। লীনা যে সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসীমামা সম্বোধন করিয়াছিল, তাহার মূলেও সেই সাদৃশ্য ও ভগ্নীর হৃদয়।

লীনা সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারে না, পারা সম্ভবও নয়। তবু, তাহার অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ কথার মধ্য হইতে এইটুকু অনুধাবন করা গেল, হাতীর পিঠের উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রার সময়ে যখন খুব ঠেলাঠেলি, হইতেছিল, আয়ার কোল হইতে নামিয়া সেই সময়ে তাহার পিতামাতার মাঝখান হইতে কি করিয়া সে একটুখানি পিছাইয়া পড়িয়াছিল, পিতা মাতাকে না দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠে। গায়ে অনেক গয়না পরা একটি স্ত্রীলোক তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কি সব বলিতে বলিতে ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসে। খানিক দূর আসার পর একজন পুরুষ ও আর একটি স্ত্রীলোক, তাহার গায়েও অনেক গয়না, আসিয়া যোগ দেয়। সে তখন খুব কাঁদিতেছিল। সেই পুরুষটা একখানা রুমাল দিয়া তাহার মুখটা বাঁধিয়া ফেলে। তাহার পর তাহারা কাপড়ের এক ঘরের মধ্যে আনিয়া মুখ খুলিয়া দেয়। লীনা কাঁদিলে তাহারা চার পাঁচ জনে চার পাঁচখানা বড় বড় ছুরী বাহির করিয়া দেখায়। লীনা ভয় পাইয়া চুপ করে। তাহারা গলার হার ও হাতের চুড়িগুলা খুলিয়া লইয়াছিল। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। লীনা আর চীৎকার করিয়া কাঁদে নাই; ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আর কিছু জানে না। তবে তাহাদের অনেকগুলা ঘোড়া, উট, মোষ, গরু, ছাগল ও ভেড়া ছিল সে তাহা দেখিয়াছে। কাপড়ের

ঘরগুলা ছোট ছোট, তার মধ্যে কুকুর, মুর্গী, হাঁস এ সবও ছিল। তাহাদেরই মাঝে দড়ির খাটিয়ায় সে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। এই বর্ণনা হইতে ইহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না যে সেটা বেদেদের আড্ডাই বটে। বেদে সকল দেশেই বেদে।

সন্ন্যাসী পরদিন আসিলেন না, তারপর দিনও অনেক বেলা হইলেও যখন তিনি আসিলেন না, তখন সরকার সাহেব ও বিভাস সেবাধর্ম্ম-ভারত ভবনে সন্ন্যাসীর খোঁজে বাহির হইলেন। ভারতানন্দ সেখানে ছিলেন না। খবর পাওয়া গেল, কাল সেবাধর্ম্ম ভারতের গৃহবিস্তারের আনুকূল্যজন্য এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাস্থলে ভিক্ষাবস্ত্রে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পড়ে, ভারতানন্দ সেই সভায় পতিত্ব করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহাদের গৃহ-বিস্তারে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন এবং আশা করা গিয়াছিল যে, একটি সভাতেই পুরা দশহাজার টাকাই উঠিয়া যাইবে, তথাপি পুরা টাকা না উঠায় তাঁহারা আদৌ হতাশ অথবা ক্ষুণ্ন হন্ নাই। ভারতানন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, আগামী অমাবস্যার পর প্রধান স্নানের পর দিন আর একটি সভাধিবেশন হইলেই বাকী টাকাটা উঠিয়া যাইবে। অমাবস্যার পর হইতেই যাত্রী ভাঙ্গিবে; সেই জন্য যাত্রী সকল চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সভার অনুষ্ঠান ধার্য্য হইয়াছে।

সন্ন্যাসীরা যে বিভাসকে শুনাইয়া এই সকল আলোচনা করিতে-ছিলেন, তা নয়; তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই আলোচনা চলিতেছিল, সরকার সাহেব ও বিভাস, বাহিরের আরও অনেক লোক যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই শুনিলেন।

বিভাস ও সরকার সাহেব অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে কি সব পরামর্শ

করিলেন; তারপর সরকার সাহেব একজন বয়স্ক সন্ন্যাসীকে ডাকিলেন, —আচ্ছা ঠাকুর, তোমাদের বিল্ডিং ফাণ্ডে পাঁচ হাজার টাকা ঘাটতি আছে বলছ তো, ধরো আমরা যদি কেউ টাকাটা দিই ?

সন্ন্যাসীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; বলিলেন, নারায়ণের ইচ্ছায় আশ্রম যে আজ বহু শাখা বিস্তার করতে পেরেছে, সে ত আপনাদের মত মহানুভবের আনুকুল্যেই সম্ভব হয়েছে। নইলে আমাদের কি সাধ্য—

সরকার সাহেব বলিলেন, শোন ঠাকুর, আমার এই বন্ধুটি পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। এক সময়ে তোমরা—

"ওর থাকা হয়েছে কোথায় ?"

বিভাস কহিল, আপনাদের আশ্রমের একখানি বাড়ীর পরেই যে বাঙলো—

সন্ন্যাসী বলিল, সেখানে ত সরকার সাহেব থাকেন, কলকাতার ব্যারিষ্টার।

সরকার সাহেব হাসিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সরকার সাহেব আমিই। উনিও ব্যারিষ্টার, নাম বিভাস সেন; আমার বাঙলোর পিছনের ছোট বাঙলোটায় উনি আছেন।

সন্ন্যাসী সরকার সাহেবকে বলিল, আমরা আপনার কাছে যাব ঠিক করছিলুম।

সরকার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমার কাছে নয়, আমার কাছে নয়, বরং যে সময় আমি থাকবো না, সেই সময় মেম সাহেবের কাছে যাবেন, নিরাশ হতে হবে না।

সন্ন্যাসীও হাসিল, বলিল, মা নিরাশ করবেন না, সে ত আমরা

জানিই ; আপনিও কি আমাদের নিরাশ করতে পারবেন ? কখনই পারবেন না। আর নিরাশ করবেনই বা কেন ? আমরা আমাদের জন্য যাচ্ঞা করি নে , যদি বা করি, সে মুষ্টিভিক্ষা মাত্র। আমরা চাই তাদের জন্যে—

সরকার সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমাদের কাজ কর্ম্ম দেখেছি, দেখে খুব খুসী হয়েছি। লাট সাহেবদেরও বলেছি। সে যাক্, আমরা চললুম, এক সময়ে যেয়ো ঠাকুর—দু'টো বলিই এক কোপে সেরে এসো।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল, নারায়ণ, নারায়ণ ! আমাদের প্রধান কর্ম্মা-স্তরে একটু দূরে গেছেন, সম্ভবতঃ আজই ফিরবেন, তিনি ফিরলেই আমরা যাবো।

বিভাস কহিল, ভারতানন্দকে দেখছি নে কেন ?

সন্ন্যাসী বলিল, তিনিই আমাদের প্রধান। কন্‌খলে, কতকগুলি যাত্রীর কলেরার খবর পেয়ে অতি প্রত্যূষে যাত্রা করেছেন। তাদের চিকিৎসার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে ফিরবেন। রোগ টোগের খবর এলে তাঁকেই ছুটতে হয়। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি ডাক্তার ছিলেন কি-না।

—ডাক্তার ছিলেন না-কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিলেত থেকে এল্ আর সি পি, এম আর সি এস প্রভৃতি উপাধি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

বেলা অনেক হইয়াছে, সরকার সাহেব ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তাহ'লে আমরা চললুম ঠাকুর, তোমাদের প্রধানকে নিয়ে শীগগির একদিন এসো।

—আসবো বৈ-কি, বলিয়া সন্ন্যাসীরা রাস্তা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া আগাইয়া দিয়া গেল।

বাড়ী পৌঁছিয়া বিভাস সরযূকে বলিল, বুঝলে সরযূ, ভারতানন্দ—লীনাকে যিনি উদ্ধার ক'রে এনেছিলেন, তিনি বিলাত-ফেরত ডাক্তার, বেশ বড় বড় ডিগ্রী ছিল।

সরযূ নির্ব্বাক দৃষ্টি স্বামীর মুখের 'পরে নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল এবং একান্ত অকারণেই দু'টি চক্ষু হইতে সূক্ষ্ম দুইটি জলের ধারা ধীরে ধীরে গড়াইয়া নামিতে লাগিল।

৫

আজ ইহাঁরা ফিরিবেন। দুই খানা গাড়ী রিজার্ভ হইয়া আসিয়াছে, ষ্টেশন মাষ্টার সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাঁধা ছাঁদাও হইয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসীরা আসিব বলিয়াও আসেন নাই। সরযূর মনের ইচ্ছা আমি জানি। আরও কয়েকদিন থাকিয়া যাইবারই তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে ত আর সম্ভব নয়। সকল কাজে নিমগ্ন থাকিয়াও একটি চোখ ও একটি কান সে বাড়ীটার বাহিরেই পাতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তেমন নির্লিপ্ত অথচ মধুর কণ্ঠের মা-ডাক ডাকিয়া কেহ তৃপ্ত করিতে আসিল না। বিভাস সাহেব বলিলেন, কলকাতায় গিয়ে ব্যবস্থা করলেই হবে! কি বল?

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। টাকাটা দেওয়া লইয়া কথা, এখানেই হোক্, আর সেখানেই হোক্, একই কথা। কিন্তু সরযূর মুখখানি ম্লান

হইয়া আসিল; চোখ দু'টির পাতায় জল আসিয়া পড়িতেছিল, গোপন করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

মোটরে জিনিষপত্র উঠিতেছে, সরযূ লীনাকে দুধটুকু খাওয়াইয়া লইতেছে, ডাক আসিল, মা! সরযূ দুধের বাটী ফেলিয়া ছুটিল। বিভাস মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, দু'দিন ধরে আপনার পথ চেয়ে আছি আমরা।

সরযূ একেবারে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বেশ লোক ত আপনি!

সন্ন্যাসীর মুখে বিমল দীপ্তি, কহিলেন, মা যদি সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা না করো, সন্তান দাঁড়ায় কোথায় বল ত মা?

সরযূ বলিল, এতদিন কোথায় ছিলেন? আজ আমরা যাচ্ছি, দু'টো কথা কইবো, তারও ত সময় নেই।—তাহার কথাগুলা কান্নায় ভেজা।

সন্ন্যাসী কহিলেন, কতকগুলি যাত্রীর অসুখের খবর পেয়ে চলে যেতে হয়েছিল মা; কিন্তু সুবিধে করতে পারলুম না। একটি ছাড়া সব ক'টিই নারায়ণের চরণে আশ্রয় নিলে, কোনও উপায় হোল না! না ভাল ওষুধ, না ডাক্তার—

সরযূ বলিল, আপনিও ত ডাক্তার!

সন্ন্যাসী বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন; ধীরে ধীরে সে ভাব কাটিয়া গেলে, বলিলেন, সে ত বিগত জন্মে মা! এ জন্মে তার কিছু কি আর মনে আছে?

বিভাস কহিলেন, আপনি এডিনবরায় ছিলেন?

সন্ন্যাসী হাসিলেন; কথা কহিলেন না।

বিভাস বলিলেন, আমাদের একটি বিশেষ আত্মীয় এডিনবরায় ছিলেন, তিনিও এল আর সি পি, এম আর সি এস পাস করেছিলেন। কিন্তু—

বিভাস মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন, সরযূর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, চোখের জলে তাহার দৃষ্টি অন্ধ, তবুও সেই দু'টি অন্ধ নয়ন দিয়াই সরযূ যেন কথাগুলাকে গ্রাস করিতেছে। বিভাস বলিলেন, আপনাকে দেখতে ঠিক তাঁর মত।

সন্ন্যাসী এক মুহূর্ত্ত অবনতমস্তকে থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আপনারা কি সুরজিৎ ঘোষের কথা বলছেন? সুরজিৎ আমার বিশেষ বন্ধু ছিল; তার শেষকৃত্য—হিন্দুমতে মুখাগ্নি, আমাকেই করতে হয়েছিল।

সরযূ আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, চেয়ারের পিঠের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীও বোধ করি ক্ষণেকের তরে বিচলিত হইয়াছিলেন—শরতের খণ্ড মেঘ, তখনি অপসৃত হইল; বলিলেন, বিলেতে অনেকেই আমাদের দু'জনকে মা'র পেটের ভাই ব'লে মনে করতো। সুরজিৎ কি আমার মা'র ভাই ছিল?

বিভাস ঘাড় নাড়িলেন।

সরকার সাহেবের ছোটছেলে আসিয়া খবর দিল, তাঁহারা রওনা হইতেছেন। ট্রেণের সময় আসন্ন।

বিভাস বলিল, চলো, আমরাও যাচ্ছি। সন্ন্যাসীকে কহিলেন, আপনি কি আশ্রম থেকে আসছেন? আমাদের প্রস্তাবটা শুনেছেন?

—শুনেছি।

—আমি চেক্ লিখেই রেখেছি, বাক্সটা বোধ করি গাড়ীতে উঠে গেছে, যদি কাউকে আমাদের সঙ্গে দেন, ষ্টেশনে গিয়ে চেক্‌খানা তাঁর হাতে দিই।

সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখ, কণ্ঠস্বর ততোধিক প্রশান্ত, কহিলেন, আপনার দান শিরোধার্য্য। কিন্তু আশ্রমের জন্যেও টাকাটা আমরা নিতে পারবো না।

বিভাস—সরযূ দুইজনেই চমকিত হইলেন ; মুখ দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বাহির হইল না। কিয়ৎপরে বিভাস ম্লানমুখে কহিলেন, অপরাধ ?

সন্ন্যাসী কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, অমন কথা বলবেন না।

—তবে নেবেন না কেন ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী নতমুখে, স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, আমরা দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করি, দুঃস্থ আতুরের সেবা করি কিন্তু—সন্ন্যাসী থামিলেন, আবার বলিলেন, উপকার বিক্রয় সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়।—তারপর সরযূর পানে চাহিয়া বলিলেন, মা অন্নপুর্ণা, রাজরাজেশ্বরী তুমি, আমার বিশ্বাস, আমার কথা তুমি ঠিক বুঝছ।

সরযূ নতনেত্রে ঘাড় নাড়িল। বুঝিয়াছে।

বিভাস বলিলেন, কিন্তু আমি যে লীনার নাম করে ঐ টাকাটা দিতে চাই ঠাকুর, নইলে, আমরাও ত মনে শান্তি পাব না।

—নারায়ণ তারও পথ করে দিয়েছেন। ঐ যে কন্‌খলের কথা বলছিলুম, আধা সরকারী একটি হাসপাতাল আছে, তা'তে না আছে ওষুধ, না আছে কোন যন্ত্র—লীনা-মায়ের নাম ক'রে টাকাটা সেই হাসপাতালে দিন, বহু দুঃস্থ আর্ত্ত উপকৃত হবে।

বিভাস সোৎসাহে কহিলে, বেশ কথা, তাই দোব। তুমি চলো আমার সঙ্গে ষ্টেশনে—

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, বললুম ত সেটা আধা-সরকারী ব্যাপার। সরকার বাহাদুর যত্ন করুন আর নাই করুন, তার ভাল বা মন্দ যা কিছু সরকারের হাত দিয়েই করতে হবে। সংযুক্তপ্রদেশের সরকারকে একটা চিঠির সঙ্গে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।

অগত্যা তাই, বিভাস সম্মত হইলেন; কিন্তু সরযূর মুখ দেখিয়া বুঝা গেল, সে প্রসন্ন হইতে পারে নাই।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আসি মা। নারায়ণ পথের বিঘ্ন দূর করুন, তোমাদের মঙ্গল করুন।

সরযূ বলিল, কবে কলকাতা ফিরবে ঠাকুর?

সন্ন্যাসী কহিলেন, কলকাতা ফেরবার আশা অত্যন্ত কম মা, আমাকে এখানেই থাকতে হবে।

সরযূ অত্যন্ত দুঃখিতভাবে কহিল, তবু—যখন ফিরবে, দেখা করবে বলো?

সন্ন্যাসী হাসিলেন। এ সেই হাসি! বলিলেন, মা, হরিদ্বার মহাতীর্থ, এখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া কি মানুষের সাধ্য?

সরযূ বলিল, তুমি পাষাণ!

সন্ন্যাসী হাসিতেছিল, কহিল, না মা, আমি সন্ন্যাসী মাত্র! নমস্কার! নমস্কার! লীনা, মা জননী, তোমাকেও নমস্কার!

ভারতানন্দ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সরযূর চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল, বিভাস সস্নেহে তাহার বাহু ধারণ করিয়া কহিলেন, চলো, বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

—::✱::—

এক

বড় থাকেন কলকাতায়; মেজ সদরে ওকালতী করেন; সেজ গ্রামের স্কুলে থার্ড মাষ্টারী করে, এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগে; আর সব ছোট বড় ভায়ের কাছে থাকিয়া দু'টা পাশ করিয়া তিনটা পাশের পড়া পড়িতেছে। বণি-বনা কেমন ছিল বা ছিল না, তাহা আগে জানা যায় নাই। এইবার জানা যাইবে।

ইহাদের গ্রামের বাড়ীটা খুব বড়; বাড়ীর গায়ের বাগানটা আরও বড়। এককালে সমৃদ্ধির শিখরারূঢ় থাকিয়া এই দত্ত-বাড়ীটা সে তল্লাটে প্রসিদ্ধ ছিল। রেল কোম্পানী সাইডিং করিবে না-কি করিবে, এই বাড়ী ও বাগানটার উপর নজর ফেলিয়াছিল। সেজ ভাই খগেন কলিকাতায় বড় ভাই যোগেনকে ও চুঁচুঁড়ায় মেজদাদা নগেনকে চিঠি লিখিয়া দিল। পূজার ছুটি আসন্ন, দু'জনেই ঝটিতি জবাব দিলেন, সেই সময় আসিয়া যাহা করিবার, করা যাইবে।

যোগেন তাঁহার স্ত্রী, ছোট ভাই লোকেন ও এক পাল ছেলে ও মেয়ে লইয়া হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িলেন। খগেন বন্ধ ঘরগুলি খুলিয়া সাধ্যমত পরিষ্কার ঝরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। যোগেনের দল উপুরে

খান চারেক, নীচে খান পাঁচেক ঘর দখল করিয়া হাঁক ডাক করিয়া গোছান-গাছানোয় মাতিয়া গেল।

সেটা অপরাহ্ন কাল। খগেনের স্ত্রী প্রিয়বালা বাড়ীর একটা কোণে দাঁড়াইয়া বিত্তশালী ভাসুরের বিবিধ ও বিচিত্র দ্রব্য সম্ভারের যাওয়া আসা লক্ষ্য করিতেছিল। ভাসুরেরই একটা চাকর সন্ধান করিয়া আসিয়া বলিল, মা বললেন, চা করে দিতে।

বৌটির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে সামান্য সামান্য জিনিষপত্র থাকিলেও ঐ বস্তুটি ছিল না। তাহারা চা খায় না; রাখেও না। তবে—হঠাৎ মনে পড়িল, সেবার স্বামীর সর্দ্দি কাসির সময় খানিকটা চা আনা হইয়াছিল, কোন কৌটাবাটার মধ্যে থাকিলেও থাকিতে পারে ভাবিয়া বৌটি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিল। চা খানিকটা ছিল; দুধও আছে, চিনি, তা'ও খানিকটা রহিয়াছে; কিন্তু বাটী কৈ? খগেনকে কলাই-ওঠা একটা বাটীতে আদার রস মিশাইয়া চা দেওয়া হইয়াছিল, সে বাটীটা আছে; কিন্তু যিনি চা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি কলিকাতার লোক। বাড়ী আসিয়া তিনি সেজ বৌকে ডাকিয়া কথা কহিলেন না বা চোখের দেখাটাও দেখিলেন না বটে, কিন্তু সেজ বৌ অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার গয়না মোড়া বিরাট বপুখানি দেখিয়াছিল। তাঁহাকে সেই ভাঙা কলাই করা বাটীতে চা দেওয়া কি উচিত হইবে? ভাবিতে ভাবিতে, প্রিয়বালা উনুন জ্বালিয়া গরম জল বসাইয়া দিল। খগেনের উপর তাহার রাগ হইতেছিল। একটা দিনও কি স্কুল হইতে একটু সকাল সকাল আসা যায় না?

জল ফুটিলে, কাঁসার বগনোয় চা ফেলিয়া একখানা সরা চাপা দিয়া

সে যখন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ছাঁকিবাব জন্য নেকড়া, ঢালিবার জন্য সেই বাটীটার সন্ধান করিতেছিল, সতেরো আঠারো বছরের একটি ছেলে আসিয়া রোয়াকটায় দাঁড়াইল। হঠাৎ অন্ধকার হইতে বাহিরে আসিয়া প্রিয়বালা অপরিচিত লোক দেখিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, যে আসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল, আমি লোকেন; আপনি সেজ বৌ-দি ত! এই নিন নমস্কার।

সে যে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া, পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল না, ইহাতে প্রিয়বালা খুসী হইল; হাসিমুখে বলিল, এস ঠাকুরপো! কোন আশীর্ব্বাদের কথা তাহার মনে আসিল না। আসিলেও সে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিত না। সেটা কি নিছক ঔদ্ধত্য বলিয়াই মনে হইত না!

লোকেন শানের উপর আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বলিল, ওতে কি হচ্ছে, বৌদি? 'বাই জোভ'—চা! ওদিকের ফরমাস হয়েছে বুঝি? তা বটে, বড় বৌদি'র সকাল দুপুর বিকেল চা না হ'লে মাথা ধ'রে যায়। কিন্তু, তাঁকে এই বাটীতে চা দেবেন নাকি?—তাহার হাসিমুখ নিমিষে মলিন হইয়া আসিল।

সেজ বৌ ম্লান দুটি চক্ষু তুলিয়া বলিল, আমাদের আর ত কিছু নেই ঠাকুরপো। তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিতেছিল।

লোকেন তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, দিন পাঠিয়ে, নেশার জিনিষ, ঐতেই অমৃত লাগবে।

চাকরটা হন্ত দন্ত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সেজ বৌ চা ছাঁকিয়া ফেলিল।

চাকর বলিল, মা'র চা হয়েছে?

লোকেন বলিল, হয়েছে, নিয়ে যা।

বাটী দেখিয়া, হয়ত বা চায়েরও রঙ দেখিয়া চাকর মিনিট খানেক হাত বাড়াইল না; লোকেন তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, নিয়ে যা না।

চাকরটা অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে, যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বাটীটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। লোকেন বলিল, বৌদি, আপনার ছেলে কৈ?

স্কুলে গেছে, এখনই আসবে।

এরই মধ্যে স্কুলে দিয়েছেন?

সেজ বৌ হাসিয়া বলিল, পড়তে কি আর যায়? মোটে ত এই পাঁচ বছরে পড়েছে; বাড়ীতে ভারি দৌরাত্ম্যি করে ব'লে উনি নিয়ে গিয়ে মালিদের কাছে আটকে রাখেন।

দেখা গেল, চাকর বাটী হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। সেজ বৌয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। চাকর বাটীটা ঠক্ করিয়া নামাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, লোকেন বলিল, তোর মা চা খেলে না? কি হল? বাটী মনে ধরলো না বুঝি?

চাকরটা জবাব দিল, মা বললেন, তিনি কি ঝি চাকর যে ঐ বাটীতে চা খাবেন?

সেজ বৌ মুখ নামাইয়া লইল। লোকেন কড়া করিয়া বলিল, তোর মা এত বাক্স পেঁটরা এনেছে, চায়ের সরঞ্জামটা আনে নি কেন?

চাকর বলিল, মা ভেবেছিলেন, ভদ্দরলোকের বাড়ীতে—

লোকেন ধমক দিয়া বলিল, যা, যা। চাকর চলিয়া গেল। বাগানের

সরু রাস্তা দিয়া খগেন ছেলেটির হাত ধরিয়া আসিতেছিল, ছেলে দূর হইতে মা'কে দেখিয়া বাপের হাত ছাড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া মায়ের পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে গিয়া, সামনে অচেনা লোককে দেখিয়া থমকিয়া গেল। লোকেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া 'যু-যু-ৎ-সু' করিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল, কি নাম রেখেছেন বৌদি ?

দিবু, বলিয়া সেজ বৌ ছেলেকে কাছে টানিয়া মৃদু স্বরে বলিল, কাকুকে প্রণাম কর, দিবু। দিবু জড় সড় হইয়া প্রণাম করিতে অসিবামাত্র লোকেন আর একটা যু-যু-ৎ-সু প্যাঁচ কসিয়া দিল। দিবু হাসিয়া আকুল।

খগেন আসিয়া বলিল, এই যে রে লোকেন! এঃ, চেহারাটা যে একেবারে পালোয়ানের মত বানিয়ে ফেলেছিস্।

লোকেন দাঁড়াইয়া উঠিল, কোনগতিকে দাদার পা দু'টা ছুঁইয়া, আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া দাদার জীর্ণ চেহারাটা দেখিয়া বলিল, ম্যালেরিয়া না থাকলে চেহারা বনে।

খগেন হাসিয়া বলিল, দাদারা কোথা ? ওপরে—যাই, দেখা ক'রে আসি। চা খাচ্ছিল কে ? লোকেন বুঝি! খাস্ নে, খাস্ নে ও সব।

এ কথার কেহ উত্তর দিল না। খগেন চলিয়া গেলে, লোকেন দিবুকে কোলের কাছে টানিতে টানিতে বলিল, কৈ বৌদি, দিবুকে খেতে দিলে না ? ও স্কুল থেকে এসে কি খায় ?

এই যে দুধ দিই, বলিয়া সেজ বৌ দুধ আনিতে ঘরে ঢুকিল।

লোকেন দিবুর সঙ্গে ভাব জমাইতেছে, সেই চাকরটা একটা শালপাতায় করিয়া ছ'খানা শোন-পাঁপড়ি আনিয়া বলিল, বৌমা কোথা গেলেন? মা খোকাকে খেতে দিলেন।

সেজ বৌ বাহিরে আসিয়া বলিল, ঐখানে রাখ।—চাকর যাইবার সময় বলিল, ছোট বাবু, মা আপনাকে জল খেতে ডাকছেন।

খাবারের 'শ্রী' দেখিয়া লোকেনের হাড়শুদ্ধ জ্বলিয়া যাইতেছিল; বলিল, বলগে যা, আমি এই খানে খাব।

দিবু, ঐ খাবার খাবি?—মা জিজ্ঞাসা করিল।

দিবু জবাব দিবার পূর্ব্বেই লোকেন বলিল, দরকার কি বৌদি, দোকানের কেনা খাবার খাইয়ে, রোজ দুধ খায়, তাই খাইয়ে দিন।

প্রিয়বালা লোকেনের মনের কথা বুঝিয়াছিল কি-না জানি-না, বলিল, ভেঙ্গে একটু খানি দিই, ওর জ্যাঠাই দিয়েছেন।—বলিয়া এক টুকরা ভাঙ্গিয়া ছেলের হাতে দিল।

চাকরটা অদৃশ্য স্থান হইতে ডাকিল, ছোটবাবু, মা আপনাকে—

বল্ এখন আমি যাব না।

তারপর এদিকে ফিরিয়া বলিল, বৌদি, আপনাদের দেশে পূজো হয়?

আমার বাপের বাড়ীর কথা বলছ ঠাকুরপো?—কিন্তু কথা আর-অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না, খগেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, ছিঃ ছিঃ কি কাণ্ড করেছ!

প্রিয়বালা এই আশঙ্কাই করিতেছিল।

বড় বৌদিকে চা দিয়েছিলে ঐ ভাঙ্গা কলায়ের বাটীতে! ছিঃ ছিঃ! নেড়াদের বাড়ী থেকে একটা কাপ আনিয়ে নিতে পারতে ত!

লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া গিয়া প্রিয়বালা বলিল, কাকে দিয়ে আনাই বল? আজ আবার দুঃখীর মা'ও আসে নি।

আমি আনছি, তুমি আবার চা-টা বসিয়ে দাও। বৌদির মাথা ধরে গেছে, গিয়ে দেখি নির্জ্জীবের মত শুয়ে আছেন। নাও, নাও—

প্রিয়বালা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, চা আর নেই!

খগেন কি বলিত, জানি-না, লোকেন বলিল, ভালই হয়েছে সেজ দা! ভগবান করুন আজ মাথাটা ধরে থাকুক, রাত্রের মধ্যে চা, কেৎলি, কাপ, সসার, চামচ সব এসে পড়বে। তোমাকে আর ধার ধোর করে বেড়াতে হবে না।

না, না, সে কি হয়! দু'দিনের জন্যে এসে অসুখ বিসুখ হয়ে পড়বে যে! আমি আনছি—

চাকরটা সেই সময়ে সেখানে হাজির হইয়া বলিল, সেজ বাবুকে মা একবার ডাকছেন।

এই যে যাই, বলিয়া খগেন আবার ছুটিয়া গেল। দিবুর দুধ খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, লোকেন বলিল, বৌদি, আমি ওকে নিয়ে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।

তুমি ত কিছু খেলে না ঠাকুরপো।

তোমার ঘরে যদি কিছু থাকে, দাও, খাই।

প্রিয়বালা মুখ নত করিতে, লোকেন হাসিয়া বলিল, মুড়ীও নেই?

তা আছে।

তবে আবার কি! তেল মেখে,—কাঁচা লঙ্কা আছে?

তারও দুঃখু নেই, ঐ বেড়ার ভেতরে অন্ততঃ একশ'টা লঙ্কা গাছ।

উত্তম, ফিরে এসে, একটি ধামা—

খগেন ফিরিয়া আসিল। এবার তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, চিন্তাকুল। বলিল, বৌদি বলছিলেন, ওঁর ছোট ছেলে মেয়েদের রাত্রে লুচি খাওয়ার অভ্যেস, তারা আবার সন্ধ্যেবেলাই ঘুমিয়ে পড়ে। দাদাও রাত্রে লুচিই খান, বৌদিরও ভাত সহ্য হয় না।

প্রিয়বালা মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিতেই, খগেন বলিল, নিমের দোকানে যাই একবার, দেখি কি পাই।

লোকেনের সামনে কথাটা বলিতে বৌ-টির মাথা কাটা যাইতেছিল, তবে না বলিয়াও নাকি উপায় নাই, তাই বলিতে হইল, নিমে ধার দেবে কি ?

দেখি।

দাঁড়াও, তুমি বরং—

লোকেন বলিল, সেজ দা, তুমি বরং একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি। বলিয়া দিবুকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া দৌড় দিল এবং সেই ভাবেই ফিরিয়া আসিয়া ছু' খানা দশ টাকার নোট সেজ দার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, এই থেকে নিয়ে এস গে।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই কি রকম একটা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন ; লোকেন বলিল, আমার স্কলারশিপের টাকাগুলো আমি চোটায় খাটাই। যতদিন না শোধ দিতে পার, স্থদ দিও, তাহ'লেই হবে। আয় রে দিবু!—বলিয়া দিবুকে যু-যু-ৎ-সুর প্যাঁচ শিখাইতে শিখাইতে চলিয়া গেল।

প্রিয় বলিল, কি করবে ?

তাই ত !

আমি বলি কি, ওর টাকাটা থাক্, আঙটিটাই তুমি—

কিন্তু মধু স্যাঁকরার দোকান বন্ধ দেখে এলুম, সে হয় ত বা সদরে গেছে। তাহ'লে—

দুই

একলা এতগুলা লোকের জন্য নানান্ খানা করিয়াও যদি নিষ্কৃতি মিলিত, তাহা হইলেও বা যা-হয় কথা ছিল। সন্ধ্যার পর হইতেই চাকর ছুটা ছুটা ছুটি করিয়া খবর আনিতে লাগিল, পলির হাই উঠিতেছে, মলি কাঁদিতেছে, শচীন ঢুলিতেছে, ইত্যাদি। লোকেন রান্নাঘরেই ছিল, ধমক্ দিয়া বলিল, তাদের এইখেনে নিয়ে আয়, খেয়ে যাক্। যে জবাব আসিল তাহাও বিশেষ স্বাদু নয়। তারা কি কোনও দিন রান্নাঘরে গিয়ে খায়?

প্রিয়বালা বলিল, আমি নিয়ে যাচ্ছি বাবা, আর দেরী নেই।

লোকেন বলিল, বৌদি, রাগই করুন আর যাই করুন, ঐটি আমি করতে দোব না। রেঁধেছেন, বেড়েছেন, বেশ করেছেন কিন্তু বারবার থালা বয়ে বয়ে দোতালায় যেতে আসতে আমি আপনাকে দেব না। হয় তারা এসে খাক্, না-হয় চাকররা নিয়ে যাক্। এই, তোর মা'কে আমার নাম ক'রে এই কথা বল্‌গে যা।

প্রিয়বালা কি বলিতে গেল, লোকেন তাহাকে থামাইয়া দিল। চাকর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা বললেন আমার হাতে দিতে।

পথে এসো, বলিয়া লোকেন হাসিল।

কিন্তু দিদি কি মনে করলেন?

যা মনে করলেন তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার সঙ্গে অন্ততঃ তিনদিন বাক্যালাপ বন্ধ। সে যাক্, আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি বৌ-দি যে, সংসারে আপনি একলা, বাটনা বাটা জল তোলা থেকে রান্না বান্না সব কাজ, আপনি একলা করেন জেনেও তাঁদের ফরমাস করতেও আটকালো না, একটা চাকর বাকর দিয়ে সাহায্য করবার কথাও মনে পড়লো না। শুধু কি তাই? এত কাণ্ড করছে যে লোক, নিজের ছোট জা সে, তা'কে ডেকে একটা কথা কইবার পর্য্যন্ত ফুরসৎ পেলেন না!

চাকরটা সামনে দাঁড়াইয়া, প্রিয়বালা যেন মরমে মরিয়া যাইতেছিল; বলিল, দেখা করবার সময় কি বয়ে গেছে নাকি ঠাকুরপো! দিদির খাবার সময় আমিই ত নিয়ে যাব তাঁর—

আচ্ছা সে দেখা যাবে। আপনি থালা গুলো ও বেটার হাতে দিয়ে দিন ত এখন।

খানিক পরে খগেন আসিয়া বলিল, দাদার খাবারটা—

লোকেন বলিল, ঠাঁই করতে বলো, আমি দিয়ে আসছি।

খগেন বলিল, তুই কেন, সেজ বৌ—

সেজ বৌ যেতে অবিশ্যি পারবেন, তাহ'লে তুমি বসে লুচি ভাজ। পারবে?

খগেন—আমি ত—বরং রুটী হলেও বা—বলিয়া ঢোঁক গিলিতে লাগিল।

লোকেন বলিল, ঠাঁই করেছে?

দেখি, বলিয়া খগেন চলিয়া গেল। প্রিয়বালা বলিল, কাজ কিন্তু

ভাল হচ্ছে না ঠাকুরপো। দিদি মনে করবেন, বৌ-টা হাড় কুঁড়ে, সেই জন্যেই তুমি —

লোকেন উচ্চৈস্বরে হাসিয়া বলিল, এত কাণ্ড রান্না দেখেও যদি ঐ কথা তাঁর মনে স্থান পায়, আমি তাঁকে মেণ্টাল ফিলজফির ডক্টরেট যোগাড় করে দোব।

খগেন উপরের বারান্দা হইতে বলিল, লোকেন দাদার ঠাঁই করা হয়েছে, বল্।

আচ্ছা।

বড় বধূ যখন আহারে বসিলেন, প্রিয়বালা লোকেনের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়াই তাঁহার খাবার লইয়া উপরে গেল। খাবার নামাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, দিদি, আগে এসে প্রণাম করতে পারি নি, অপরাধ নেবেন না, জানেনই ত!

উত্তরে বড় বধূ যাহা বলিলেন, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই হৃদয়বিদারক। তিনি ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বাঁকা সুরে কহিলেন, দশটা বেজে গেছে দেখছি। আমার ৮টার সময় খাওয়ার সময়, একটু দেরী হলে আর হজম হয় না। অত গুলি লুচি কি হবে বাছা, তুমি তিনখানি রেখে সব তুলে নিয়ে যাও। ঐ তিন খানি, তা'ও কাল সকালে গলা জ্বলে সারা হয়ে যাব'খন!

প্রিয়বালা বলিল, যা পারেন দিদি—

না, না, পারা পারির কথা হচ্ছে না, তুমি নিয়ে যাও। দু'দিনের জন্যে এসে শেষে কি অসুখে পড়ে যাব! নাও, তুলে নাও।

থাক্‌না দিদি, আপনার পাতে থাকলে ফেলা যাবে না। আপনার পেসাদ খাবার লোকের অভাব নেই।

এই কথাটায় বড় বধূ কিছু প্রসন্নভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, তোমার ছেলেটিকে ত কই দেখলুম না।

ঘুমিয়েছে দিদি। কাল সকালে পাঠিয়ে দোব।

বড় বধূ আর কোন কথা না বলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। সব ক'খানিই খাইলেন—অসুখ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই বোধ করি একখানি ফেলিয়া রাখিলেন। কিম্বা এমনও হইতে পারে, তাঁহার পাতের প্রসাদ প্রত্যাশীদের একেবারে বিমুখ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

লোকেন রান্নাঘরেই বসিয়াছিল, বলিল, কি বললেন?

প্রিয়বালা বলিলেন, দিদি বললেন, আগে জানলে ঠাকুরটাকে সঙ্গে আনতেন!

লোকেন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, ন্যাকামী! আমি যেন কিছু জানিনে! দাদা ত বলেছিলেন, খগেনের ছেলেমানুষ বৌ একলা, ঠাকুর চলুক। 'ওমা, তা কি ক'রে হয়? আমার বাড়ী একলা পড়ে থাক্‌বে! সে আমি প্রাণ ধ'রে ফেলে যেতে পারবো না।' এখন আবার সাওখুড়ী হচ্ছে!

খগেন কোথায় ছিল বলা যায় না; ধমকাইয়া বলিল, এই লোকেন, গুরুজনদের সম্বন্ধে কথাগুলো বেশ সম্মানজনক হচ্ছে না।

লোকেন জিব কাটিয়া চুপ করিল। কেবল প্রিয়বালাই শুনিতে পায় এমন ভাবে বলিল, ও বাবা! মাষ্টার মশাই কোথায় ছিলেন এতক্ষণ!

দু'জনেই হাসিল।

পল্লীগ্রামে এই সময়টা মাছের বড় আকাল। কতকগুলা আমাছা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না, তাই সকালে যখন খবর আসিল যে অন্ত ডাল তরকারী যা হয় হোক্, রুই মাছের ঝোলটা নিতান্তই দরকারী, তখন খগেন মাথায় হাত দিয়া বসিবার উদ্যোগ করিল। প্রিয়বালা হাসিয়া বলিল, তুমি নদীর দিকে যাও না বেড়াতে বেড়াতে, বলা ত যায় না, যদিই কেউ জালে গিয়ে থাকে। আর যাবার সময় আব্দুলকে একবার ডেকে দিয়ে যেয়ো।

খগেন, যাচ্ছি, কিন্তু—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আব্দুল এক জন দক্ষ শিকারী। বাঘ হইতে মাছ তাহার হাত এড়াইয়া বাঁচিবার সাধ্য কাহারও নাই। কবে আব্দুলের মেয়েটির নাকি কলেরার মত হইয়াছিল, প্রিয়বালার দেওয়া এক ফোঁটা ওষুধে মরা মেয়ে বাঁচিয়া উঠিয়াছিল; তদবধি সে প্রিয়বালার ছেলে হইয়া পড়িয়াছে। আব্দুল আসিয়া বলিল, মা, হুকুম কর গো। বড় তাড়া মা, রহিমের বাপ মরেছে, মাটী দিতে যেতে হবে।

রহিম তাহার জামাই, পাশের গ্রামে বাড়ী।

কখন যাবে ছেলে? আমার যে একটু কাজ ছিল।

তোমার কাজ না সেরে কি যাব গো! সে শালার ভাই শালা থাক্ না খানিক পড়ে। বল, কি হুকুম?

প্রিয়বালা বলিল, বড় বাবুরা এসেছেন, জানই ত, তাঁরা কলকাতার লোক, ভাল বড় মাছ না হলে তাঁদের খাওয়ার কষ্ট হয়। পুকুর ডোবা ত জলে ভেসে আছে, জাল ফেলে মাছ ধরার আশা মিছে। তাই বল-ছিলুম, তুমি যদি তোমার ল্যাজা ট্যাজা দিয়ে একটা মাছ মেরে এনে দাও—

তা দেখি, বলিয়া আব্দুল এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর বলিল, নসী ঠাকুরদের পুকুরে কালও ভাসছিল, দেখে এসেছি; হালদার গিন্নীর পয়সারও ভারি খ্যাঁচ, দেখি লেজাটা নিয়ে যাই।

প্রিয়বালা কুন্ঠিত ভাবে বলিল, আমি কিন্তু মাস কাবার না হলে তোমাকে—

আব্দুল বলিল, ঐ! ঐ জন্যে ত তোমার সঙ্গে বনে না, মা—বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই লোকেন দিবুকে কাঁধে করিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল, এখন এক কাঁধে প্রকাণ্ড এক পোঁটলা, অন্য কাঁধে দিবুকে লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, বৌ-দি!

পুঁটলিটা ধর শীগগির, আমার কাঁধ ভেরে গেল। দিবেটা যে বড্ড ছোট, নইলে ওটা ওর কাঁধেই তুলে দিতুম।

পুঁটলির ভিতর হইতে কত রকম তরকারী যে বাহির হইল, বলিবার নয়। কাল নিমের দোকান হইতে শুধু আলুই আসিয়াছিল, আজ যে কি করিয়া কি হইবে ভাবনার তাহার অন্ত ছিল না। অন্তর্য্যামীর মত এই দেবরটি কত বড় দুর্ভাবনা হইতে বাঁচাইল তাহা ভগবানই জানেন। লোকেন কোথায়, কিরূপে এই সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত হইল তাহারই বিস্তারিত ইতিহাস বিবৃত করিতেছে, সিল্কের ফ্রক পরা দু'টি মেয়ে অদূর হইতে বলিল, দুধ এসেছে?

পল্লীগ্রামে গোয়ালা বেলায় আসে। সাধ্য সাধনা করিলেও সকালে দুধ পাওয়া যায় না। প্রিয়বালা বলিল, এখনও আসে নি মা। এলেই আমি গরম ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর সদ্যঃ সংগৃহীত পেয়ারার

দিকে নজর পড়িতেই তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, পেয়ারা খাবে, নিয়ে যাও।

ও আমরা খাই নে, বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

সত্যিই হয়ত তাহারা খায় না কিন্তু যে সুরে ও যে ভাবে কথাগুলা বলিয়া গেল, তাহাতে লোকেনের পা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল ; তাহাদেরই গলার স্বর অনুকরণ করিয়া বলিল, ও আমরা খাই নে ! মারতে হয় ঠাস্ ক'রে গালে এক চড়। না খাস্ না খাবি, যা। এসো ত দিবা বাবু, আমরা খুড়ো ভাইপোয় এগুলোর সদগতি করি। বৌদি, তুমিও লুকিয়ে লুকিয়ে দু'টো খেয়ো বুঝলে ! ঐ যাঃ ! তুমি বলে ফেললাম যে !

বেশ করেছো ঠাকুরপো।

দিবা বাবু, কোন্‌টি নেবে বল ?

দিবু বড়টা দেখাইয়া দিলে, লোকেন বলিল, এইটি নিয়ে ক'টি হল, কাকু ?

সেই দু'টো আর এই একটা। তিনটে, না কাকু ?

লোকেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, হিসেবে একটু ভুল থেকে গেল কাকু, প্রথম হোল সেই পাকাটা, তারপর সেই ডাঁসাটা আর রাস্তায় আর একটা—তিনটে, এখন একটা, চারটে। আর আমার আট-টা না ন'টা ? ন'টাই হবে।

প্রিয়বালা হাসিতে হাসিতে তরীতরকারীগুলা গুছাইতেছিল, মা কৈ গো—বলিয়া আব্দুল মস্ত একটা কাৎলা মাছ হাতে করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দিবুর পেয়ারা খাওয়া মাথায় উঠিল, পেয়ারা রাখিয়া

উঠানে ছুটিল। আব্দুল মাছটাকে নামাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, মাছটা আমার দাদাভায়ের চেয়ে বড়।

ওমা, দেখ, দেখ, এখনও হাঁ করছে। দেখসে না।

দেখেছি রে দেখেছি। তোর আব্দুল দাদা গেল আর নিয়ে এল!

লোকেনও মাছটার দিকে আকৃষ্ট হইয়া এই দিকেই আসিয়াছিল, তাহার পিঠ হইতে গল গল করিয়া রক্ত পড়িতে দেখিয়া বলিল, কি দিয়ে ধরলে?

আব্দুল হাসিয়া বলিল, ধরা নয় গো, মারা। লেজা দিয়ে।

লোকেন বলিল, লেজা কি?

সে এক রকম অস্ত্র।

আব্দুল, এটি আমার ছোট দেওর, কলকাতায় থাকে, বি-এ পড়ে।

আব্দুল একটা হাত কপালের কাছে তুলিয়া বলিল, সেলাম ছোট বাবু! আপনারা এখন থাকবে বুঝি?

ছোট বাবু সে কথার উত্তর দিল না; বলিল, লেজা কি?

আমার ঘরে এসো, দেখাবো। দাদুভাই আমার বাড়ী জানে। না দাদু?

দিবু কহিল, হুঁ। সেই ওদিক দিয়ে ওদিক গিয়ে ওদিকে—না আব্দুল! তারপর আবার ওদিকে—

নে থাম্, সব ওদিকে, তাহার মা তাহাকে থামাইয়া দিয়া আব্দুলকে বলিল, হালদার গিন্নি কত দাম চাইলেন?

দশ টাকা, বিশ টাকা—ত্রিশ টাকা, বলিয়া আব্দুল রাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখনি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বেইকে গোর দিতে চল্লুম মা, কাল সকালে ফিরবো, দরকার হলে ছেলেকে খবর পাঠিয়ো।

উটি কে বৌদি!

প্রিয়বালা বলিল, তোমার বৌদির বড় ছেলে; সে সুবাদে তুমি ওরও কাকা।

তিন

এইবার মেজ বাবু ও মেজ গিন্নী আসিলেন। জিনিষপত্র বেশী আনিলেন না, তবে লোক আনিলেন অনেকগুলি। ঠাকুর, চাকর, ঝি এই সব। ঝাড়া হাত পা, দু'টি ছেলে, দু'টিই বিলাতে পড়িতেছে। মেজ-গিন্নির বয়সটা ঠাওর করা মুস্কিল! চল্লিশ হইতেও পারে, কমও হইতে পারে। লম্বা, পাতলা ছিপছিপে গৌরবর্ণ লোকটি। বেলা তখন ৯টা, সোজা রাঁন্নাঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কি রাঁধছিস রে সেজ?

মেজদি এসেছ? আমার দু'হাত এঁটো দিদি, বলিয়া সেজ বৌ পায়ের কাছে মাথাটা নত করিল। মেজ বৌ দু'হাতে তাহার মুখখানাকে মুখের উপর টানিয়া লইয়া, ছেলেমানুষে যেমন করিয়া চুমা খায়, সেই রকম করিয়া চুমা খাইয়া বলিলেন, ঠাকুরপো কোথায়? ওঁরা সব কোথায়? ছেলে পুলে সব এয়েছে ত? তোর খোকা কৈ?

সেজ বৌ কড়ায় কি একটা চড়াইয়াছিল, সেটা চড় বড় করিতেছে, বলিল, ওটা নামিয়ে রেখে তোমার কথার জবাব দিচ্ছি, দিদি।

মেজ বৌ ততক্ষণে রোয়াকে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, মধু, ঠাকুরকে বল্ চান্ করে রান্নাঘরে আসুক শীগগির। আর ঝিকে এদিকে ডেকে দে। সেজ বৌয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমি একবার দেখা শুনো ক'রে আসি, সেজ। আর ঠাকুর এলে তাকে সব দেখিয়ে টেখিয়ে দিবি, বুঝলি? না, না, সে সব হবে

না। হলই বা দু'দিন, ওরা বসে থাকবে আর আমরা হাঁড়ী ঠেলবো? বটে! হ্যাঁ রে নদীতে জল আছে ত? তোতে আমাতে চান্ করতে যাব। আমি বলে সেই লোভেই এলুম। এই যে ছোট ঠাকুরপো, মস্ত মাছ যে! ঐটি বুঝি তোর ছেলে, সেজা?

নাঃ, মাথা ঠুকতে আর পারি নে বাবা, বলিয়া লোকেন মাছটা নামাইয়া প্রণাম করার কাজটা কোন মতে সারিতে উদ্যত হইয়াছিল, মেজ বৌ তাহাকে একরকম জড়াইয়া ধরিয়াই বলিলেন, কাজ কি ভাই মাথা ঠুকে, শেষে অমন ভাল মাথাটিতে ব্যথা হবে।

লোকে শোনে কৈ, বলিয়া লোকেন প্রণাম করিয়া ফেলিল এবং 'কাকু জ্যাঠাইমাকে প্রণাম কর' বলিয়া দিবুর মাথাটাও নীচু করিয়া ধরিল। সোনা আমার চাঁদ আমার, বলিয়া মেজ বৌ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। অজস্র চুম্বন করিয়া, নামাইয়া দিয়া কটিতে আবদ্ধ রুমালখানি টানিয়া বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে লিকলিকে এক গাছি সোনার হার লইয়া দিবুর গলায় পরাইয়া দিলেন। সেজ বৌ খুন্তীহাতে দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়াছিল, ছেলেকে বলিল, দিবু, জ্যাঠাইমাকে নমঃ কর বাবা। দিবু আবার নমঃ করিতে যাইতেছিল, মেজ বৌ ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, হয়েছে, বেঁচে থাক, ভাল থাক। লোকেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বড়দির ছেলে মেয়েরা গেল কোথায়? তাদের দেখছি নে কেন?

লোকেনের, কেন জানি-না, বোধ হয় অকারণেই চোখে খানিকটা জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সেটা গোপন করিবার জন্য ওদিকে ফিরিয়া বলিল, বাস্রে, পাড়া গাঁ, ম্যালোয়ারীর জায়গা, মাটিতে পা দেবে? এসেছে এই না আমাদের সাতপুরুষের ভাগ্যি।

দিদি ?

বাপস ! বলিয়াই লোকেন হাসিয়া ফেলিল।—ডাক্তার নাকি মাথার দিব্যি দিয়েছে, রোগা শরীরে পাড়াগাঁর হাওয়া লাগাবেন না।

মেজ-বৌ কথাটা বোধ করি বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, দিদি রোগা হয়ে গেছেন নাকি ?

লোকেন মুখ অতীব ম্লান করিয়া, একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ভীষণ ! ভীষণ ! একেবারে খ্যাংরা কাঠিটি !

সেজ বৌ হাসিয়া রান্নাঘরে লুকাইল। মেজ-বৌও হাসিতেছিলেন; বলিলেন, যাই, রোগা মানুষটির পায়ের ধূলোটা নিয়ে আসি।

বৃথা, বৌদি, বৃথা। পরশু এসে অবধি ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন, পায়ে ধূলো লাগবার সুযোগই দেন্ নি, আপনি নেবেন কোথা থেকে। বলিয়া লোকেন দিবুর হারটা দেখিতে দেখিতে বলিল, কি সুন্দর গড়নটি বৌ-দি ! হ্যাঁ বৌদি, বিশু, খোকার খবর পেয়েছ ?

হ্যাঁ ভাই, পেয়েছি, ভালই আছে। না, আর দেরী নয়, দিদি আবার রাগ করবেন,—বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, সেজ বৌ জিজ্ঞাসিল, মেজ দি, চা খাও নাকি ?

তা আর খাই নে ! তার জন্যে তুই ভাবিস নে সেজা। সব আমার সঙ্গেই আছে। ঠাকুর চাকর আসুক, করে দেবে। তোর ভাসুর ত বাড়ীই এলেন না, কোথায় কি বিলে হাঁস আছে খবর পেয়ে দেখতে গেছেন। এলেই, ঠাকুরকে বলিস, চা করতে। তিনি চলিয়া গেলেন।

সেজ বৌ লোকেনের পানে চাহিল, লোকেন তাহার পানে চাহিল। দু'জনের চোখে চোখে যে-কথাটা হইয়া গেল, দু'জনেই তাহা বুঝিল, তাই মুখ খুলিবার দরকার হইল না। সেজ বৌ রান্নাঘরে ঢুকিতেছিল,

লোকেন বলিল, আমরা খুড়ো-ভাইপোয় এত বড় শিকার নিয়ে এলুম, তার জন্যে একটা ধন্যবাদও বুঝি নেই!—বলিয়া সে মাছটার দিকে তাকাইল।

ধন্যবাদ বুঝি শুধু মুখ দিয়েই বলতে পারা যায় ঠাকুরপো, সেজ বৌ জিজ্ঞাসা করিল।

না, না, তা না—

আব্দুল মারলে ত?

লোকেন উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য হাতের টিপ, বৌদি! একটা জায়গায় বুড়বুড়ি উঠছিল, দু'মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলে, আমাদের বললে, রুই মাছই হবে। ব'লেই লেজা ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গে মাছ নিয়ে লেজা ভেসে উঠলো। কি টিপ রে বাবা!

সেজ বৌ জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ধরলে? কাদের পুকুর?

দিবু বলিল, সেই ওদিকে গিয়ে ওদিকে সেই যে ওদিকে—

লোকেন তাহার গালটা টিপিয়া দিয়া বলিল, তুই থাম্ ওদিকওলা। আমি ত পুকুর চিনিনে বৌ-দি, তবে দাম জিজ্ঞেস্ করেছিলুম, বললে বাড়ী গিয়ে মাছ খেয়ে দেখো কাকা, ভাল হয় তখন দামের কথা।

ঐ জন্যেই ত ওকে কিছু বলি নে, দাম ও নিজেই দেবে, কিছুতে নেবে না।

সেইদিন বিকালের দিকে মেজ ভাই নগেন খগেনকে ডাকিয়া বলিলেন, সিজের জঙ্গলটায় শুনলুম নেকড়ে এসেছে, লোকের গরু বাছুর মারছে, তোদের এখানে এমন শিকারী কেউ নেই রে, যে রাত্রে শুধু সঙ্গে যেতে পারে?

খগেন বলিল, আব্দুল আছে, খুব ভাল শিকারী।

তাকে ডেকে পাঠা এখুনি। আজই রাত্রে ওটাকে মেরে দিই। চাষাভূষোদের বড় অনিষ্ট করছে।

আমি ডেকে আনছি, বলিয়া লোকেন দিবুকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

দুই ভাই নিরালা হইলে নগেন বলিলেন, খাওয়া দাওয়ার এত খরচ পত্র করছে কে? দাদা টাকা কড়ি—

খগেন কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, সে এক রকম করে—

ভারি মাতব্বর তুমি, আমি জানি!—বলিয়া মণি ব্যাগ খুলিলেন। নোটের একটি তাড়া খগেনের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, এক শ' আছে, এখন এই ধর। তুই এখন পাস্ কত?

ষাট টাকা।

কুলিয়ে যায় ত! তা হ'লেই হল। আব্দুল থাকে কোথায়?

এই কাছেই।

তবে এখনও আসে না কেন! মেজ কর্ত্তার মনে ও চোখে নেকড়েটা থাবা ফেলিয়া বেড়াইতেছিল।

ঐ যে, ওরা আসছে।

দেখা গেল, লোকেনের সঙ্গে একটি পাকা-দাড়ী মুসলমান আসিতেছে, তাহার কাঁধের উপর দিবু। মেজ কর্ত্তার চাকর নন্দা উঠানের ধার দিয়া কোথায় যাইতেছিল, মেজ কর্ত্তা বলিলেন, নন্দা, আমার বন্দুকগুলো নামিয়ে আন্ ত! দু'টোই আনবি।

মেজ বৌয়ের ঠাকুর ও ঝি রান্নাঘরের ভার লইয়াছে, সেজ বৌয়ের

হাত খালি, যে ঘরটায় মেজ বৌ আছেন, সেই ঘরের সামনে আসিয়া ডাকিল, মেজ-দি।

মেজবৌ সস্নেহে বলিলেন, আয় না রে সেজা, আয়। চা খাবি একটু?

আমি ত খাই নে দিদি, ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বড় গিন্নিও বসিয়া আছেন, একটু হাসিয়া, বড় জায়ের পাশে গিয়া বসিল।

বড় গিন্নি অপ্রসন্নমুখে কহিলেন, একটু অভ্যেস রাখলে ভাল করতে বাছা! তাহ'লে এই তিনটে দিন আমাকে যম-যন্ত্রণা সইতে হোত না।

বেচারা সেজ বৌ লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। বড় গিন্নি তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, বুঝিয়াও বুঝিলেন না। সেই প্রথম দিনের চায়ের ব্যাপারটা বেশ ফলাও করিয়া, রং লাগাইয়া মেজ বৌকে শুনাইতে লাগিলেন। হাসিবার কথা, মেজ বৌয়েরও হাসি আসিতেছিল, কিন্তু হাসিলেন না। সেজ বৌয়ের মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছিলেন, কথাগুলা যেভাবে বলা হইতেছে, তাহাতে আর একজনকে ছুঁচ দিয়া বিঁধিতেছে। বলিলেন, এইবার ওকে আমি শিখিয়ে দিয়ে যাব, আর এই সেট টা রেখে দিয়ে যাব, অতিথি অভ্যাগতের মান রাখতে পারবে। সেজা, একটু খেয়ে দেখবি নাকি রে?

সেজ বৌ অতি ক্লান্ত দু'টি চোখ তুলিতেই মেজ বৌয়ের ব্যথিত হৃদয়ে ব্যথা বাজিল। পাছে বড়গিন্নি কোন মন্তব্য করিয়া আবার ব্যথা দেন, তাই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, দাঁড়া দেখি, তিন কাপের মত জল নেওয়া ত হয়েছে, তোর বরাতে হয় ত জুটবে না।

নন্দা বন্দুক লইয়া নীচে যাইতেছিল, মেজ বৌ বলিল, নন্দা, বাবুর চা নিয়ে যা।

নন্দা বলিল, বন্দুক দিয়ে আসছি মা।

অমনি দিবুকে আনিস্ ত! হ্যাঁরে সেজা, তোর ছেলে তোর কাছে থাকে না?

সেজ বৌ কি বলিতে যাইতেছিল, মেজ বৌ বলিলেন, ওর ভাই হবে, না রে?

লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে সেজ বৌ মেজ জা'কে ভ্রূ-কুটি করিল।

শুধু চা নয়, চায়ের আনুসঙ্গিকগুলাও অনেক। নন্দা দিবুকে আনিলে, মেজ বৌ স্বামীর চা ও আহার্য্য তাহার হাতে দিয়া দিবুকে লইয়া পড়িলেন। তাহার একহাতে বিস্কুট, অন্যহাতে কেক্‌টেক্ দিতে, দিবু মায়ের পানে চাহিল। মা বলিল, খাও।

তুই না বললে খায় না বুঝি? খুব বাধ্য ছেলে ত তোর!

বড় বৌ দিবুকে ইহার আগে দেখেন নাই। এখন দেখিলেন এবং বলিলেন, গলায় হার দিয়ে রাখা কেন? পাড়া গাঁ জায়গা, বাড়ীতে—

সেজ বৌ মৃদুস্বরে কহিল, হার কোথায় পাবে দিদি, যে গলায় দিয়ে থাকবে; ওটা আজই ওর মেজ জ্যাঠাই দিয়েছেন, একটা দিন পরে থাক্, কাল তুলে রাখবো।

বড় বৌ মেজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গড়ালি, না ছেলেদের ছিল?

মেজ বৌ বলিলেন, গড়ালুম দিদি। ঐটের জন্যেই ত কাল আসা হল না। পর্শু দেবার কথা, দিলে না, দিলে কাল রাত্রে!

দেখি হারটা খোকা।

সেজ বৌ হারটা খুলিয়া বড় জায়ের হাতে দিল। তিনি সেটাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ক'ভরি হল ?

—দেড় ভরি দিদি। কিন্তু গড়েছে বেশ। না দিদি ?

মন্দ নয়, বলিয়া বড় বধূ চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলেন।

মেজ বৌদি, বেশ লোক ত তুমি—বলিতে বলিতে লোকেন্দ্র ঘরে ঢুকিল। একখানা প্লেটে নানাবিধ সজ্জিত মিষ্টান্ন একপাশে রাখা ছিল, মেজ বৌ হাসিমুখে সেখানি লোকেনের সামনে ধরিলেন। লোকেন বলিল, মুখ বন্ধ হয়ে গেল, আর কিছু বলা গেল না।

মেজ বৌ হাসিয়া বলিলেন, বন্ধ করবে কেন, বল না ?

লোকেন বলিল, বলবার পথ রাখলে কৈ আর বল, এই যে বন্ধ হয়ে গেল।

বড় গিন্নি বলিলেন, লোকু ঠাকুরপো তাহ'লে এখানেই আছে ? ক'দিন দেখি নি কি-না, আমি ভাবলুম, বুঝি বা সেই দিনই কলকাতায় চলে গেছে !

লোকেন রঙ্গভরে কহিল, এলুম একসঙ্গে, আর যাব একলা, তাও কি হয় ! এক যাত্রায় পৃথক ফল ?

তিন দিন চুলের টিকিটিও দেখা যায় নি কি না তাই বলছি। ভাগ্যিস মেজ বৌ এসেছিল, তাই তবু দেখতে পাওয়া গেল।

লোকেন খাইতে খাইতে বলিল, সে কথা তোমার একশ'বার সত্যি বৌ-দি। মেজ বৌদি না এলে শুধু আমাকে কেন, ঐ গরীব বেচারাকেও এই ঘরে চাঁদের হাটবাজার বসাতে দেখতে পেতে না।

কথাগুলোর অন্তর্নিহিত খোঁচা অনুভব করিয়া মেজ ও সেজ দু'জনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

বড় বধূ বলিলেন, মানেটা কি ঠাকুরপো ?

মানেটা ত খুব সহজ! মেজ বৌদির ঠাকুর চাকর ঝি রান্নাঘরের ভার নিতে তবে ত ও বেচারা একটু ছুটি পেলে, নইলে একলা পঞ্চাশ-জনের পাঁচ বেলার—

বড় বধূ গরম হইয়া বলিলেন, পঞ্চাশজনটা কে হল আবার!

লোকেন হাসিতে হাসিতে বলিল, গুণে দেখ। তোমার পাঁচটা চাকর, পাঁচ পাঁচ পচিশ; আমি ওয়ান্ ইণ্টু ফোর, চার—উনত্রিশ হল।—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

তারপর ?

আর তারপরে গেলে শত্রুর মুখে ছাই দিতে হবে কিন্তু।

বড় বধূর মুখে সেই একটা কথা ছাড়া অন্য কথাই জুটিল না; বলিলেন, তারপর ?

তারপর আর কি! দেখলুম বৌটি একলা মারা পড়ে। ঐ ত দু'খানা হাড়, দেহ রক্ষা করলে সেজ দা'র যা-হক দু'বেলা দু'মুঠো জুটছে, তাতেও ছাড় পড়বে; তাই আনাড়ি হাতে যতটা পারছিলুম, বুঝলে না ?

বড় বধূর মুখ চোখ চৈত্র বৈশাখের মাঠের মত ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। কিন্তু গলার স্বরটাকে যতখানি সম্ভব করুণ করিয়া বলিলেন, সেজ বৌয়ের বরাত ভাল, ব্যথা বোঝবার একজন লোক জুটেছে!

লোকেন কি বলিতে যাইতেছিল, বড় বধূ তাহার আগেই বলিয়া

উঠিলেন, এতকাল কলকাতার বাড়ীতে আছে, কুটোটি নেড়ে উপকার করতে ত দেখি নি বাবু!

লোকেন আগের মতই হাসিতে হাসিতে বলিল, দরকার হয় নি বৌদি। হলে দেখতে পেতে, কুটো নয়, ভারী ভারী খাট পালং নাড়বার শক্তিও লোকেন চন্দ্র রাখে।

বড় বধূ ক্রোধে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিলেন ; কি বলিবেন, কথা যেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, হঠাৎ ভাষা আসিল—অত্যন্ত কদর্য্য ভাষাই আসিল ; বলিলেন, খাট পালং নাড়বে—মানে ?

লোকেন অর্দ্ধভুক্ত কেক্‌খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে কহিল, দোহাই বৌদি, পায়ে ধরছি, বিশ্রী কথাটা মনেও এনো না। মা'র পেটের ভাই—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা ; আর তোমাকেও আমি মা'র মতই ভক্তি করি।

আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না, হয়েছে, বলিয়া বাড়ীর বড় বধূ তাঁহার মস্ত বড় দেহটা লইয়া বড় কষ্টে উঠিয়া থপ্ থপ্ করিতে করিতে স্থান ত্যাগ করিলেন। ঘরটা যেন এক মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া গেল। লোকেন "তার চেয়ে নেকড়ে বাঘ ভাল," বলিয়া, দিবুকে কাঁধে উঠাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। সেজ বৌ মেজ বৌয়ের দিকে চাহিল, মেজ বৌ চুপি চুপি কহিলেন, চ' নীচে পালাই। পলাইয়া তাহারা গেল বটে, কিন্তু মনের দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত যে কৃষ্ণ মেঘ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল, তাহার কোন ফাঁকে এতটুকু আলো অথবা একটু স্বস্তি পাইল না। কেহ মুখ ফুটিয়া কোন কথাই কাহাকেও বলিতে পারিল না বটে, তবে দু'জনেই বুঝিল, রাত্রে খাওয়ার সময়টা আসিলে এবং উত্তীর্ণ না

হইলে কিছু বুঝা যাইতেছে না। তাহাদের ভাগ্য ভাল, আহারাদি নির্বিঘ্নেই শেষ হইল ; আকাশে মেঘ রহিল বটে, একটা দিকে একটু নীল দেখা গেলে মানুষের যেমন ভরসার উদয় হয়, ইহারাও সেই ভরসা করিতে লাগিল।

তাহারা যদি বড় বধূর সঙ্গে ঘর করিত, তাহা হইলে তাহাদের অজানা থাকিত না যে, বড় বধূ ঠাকুরাণী তাহাদের একজন, যাহারা নিজে কিছু করিতে অথবা উদ্যোগী হইয়া কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে মস্তকে বজ্রাঘাত অনুভব করেন। একটা-কিছু করা দরকার এটা তাঁহারা খুব বোঝেন কিন্তু করিয়া লইবার জন্য নিজেকে চেষ্টিত হইতে হইবে চিন্তামাত্রেই তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম সর্ব্ব যত্ন ও চেষ্টা বিবরে মুখ লুকায়।

কিন্তু পরের দিন সকাল হইতেই লোকেনের অসাধারণ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। লোকেন এদিকেই মাড়াইল না এবং মাঝে মাঝে তাহার কণ্ঠস্বরের গতি নিরীক্ষণ করিয়া ইহাই বুঝা গেল যে, সে বড়বধূ ঠাকুরাণীর ইজারা মহলেই আটকা পড়িয়া গিয়াছে। দিবু সকাল হইতে 'কাকুর সঙ্গে বেড়াতে যাব, কাকু চান করিয়ে দেবে' করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু কাকুর দেখা নাই। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ঠাকুর-চাকর বড় কর্ত্তাদের সঙ্গে তাহার খাবারও উপরে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইল। মেজ বৌ এ সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন কি-না বলা যায় না, সেজ বৌ একেবারে কাঠ হইয়া গেল। তাহার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, কালকের সমস্ত অপরাধ একা তাহারই ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। অপরাধ এত গুরুতর এবং তাহার মার্জ্জনাও নাই ভাবিয়া দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। হয়ত গুরু অপরাধের সংবাদ তাহার স্বামীর কাণেও

গিয়াছে, হয়ত বা বড় ঠাকুরও শুনিয়াছেন এবং সকলেই তাহাকেই ছি ছি করিতেছে। অথচ সে যে আদৌ অপরাধী নয়, অন্যে অপরাধ করিয়া তাহারই সমস্ত বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে সাধু বনিয়া গিয়াছে ইহা ভাবিতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছিল। খগেন কি-একটা কাজে ঘরের সুমুখ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার পানে ফিরিয়াও চাহিল না। ইহা দেখিয়া প্রিয়বালা নিশ্চিত বুঝিল যে, কথা চাপা নাই। স্বামীর মুখটা যেন অমাবস্যার রাত্রির মতই ঠেকিতে লাগিল। মেজ দি'ও অন্য দিনের মত নানা ছলে আসিয়া হাসিগল্প করিতেছেন না, প্রিয়বালার মন বলিল, তাহার মূলেও সেই কথা। কাজে কর্ম্মে প্রিয়র এতোটুকু উৎসাহ আর রহিল না ; বরং মনে হইতে লাগিল, সব ফেলিয়া ঝেলিয়া কোনও একটা অন্ধকার ঘরে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারিলেই যেন বাঁচে।

তার উপর, দিবুর আব্দার। দিবু কাকুর জন্য শেষ পর্য্যন্ত কান্না জুড়িয়া দিল এবং মা'র কাপড় টানাটানি করিয়া মহা হাঙ্গাম বাঁধাইয়া ফেলিল।

নেকড়ে মরে নাই, তৎপরিবর্ত্তে দুইটা শৃগাল ও একটি গো-বৎস ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। অব্দুল মানা করিয়াছিল, নগেন ধৈর্য্য ধরিতে পারেন নাই, তিনটা গুলি ছুঁড়িয়াছেন, অব্যর্থ সন্ধান, তিনটা পশুই মরিয়াছে কিন্তু নেকড়ে বাসাতেই থাকিয়া গেল। অনেক বেলায় নগেন মুখ অন্ধকার করিয়া ফিরিলেন। যাহার গো-বৎস তাহাকে তিনচারগুণ দাম দিয়া তুষ্ট করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত দরকার। গ্রামের পুরোহিত সেই ব্যবস্থা দিতে আসিলেন। খগেন দৌড় ঝাঁপ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বড়বধূ বেশী কথা বলেন নাই; সাধারণতঃ বলেন না। হিন্দুর গো-হত্যার মত মহাপাপ আর নাই, তাই একটা দু'টা কথা বলিতেও হয়। বলিলেন, ঐ বৌটাই অপয়া।

লোকেন সেখানে ছিল, প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, বড় বধূ উপসংহার করিলেন এই বলিয়া যে ও যদি অলক্ষ্মী অপয়াই না হবে, পাঁচ পাঁচটা পাশ ক'রেও সেজ ঠাকুরপোর এমন দশা কেন! সত্যি কথা বলতে কি, পাস টাসগুলো ঐ-ই ত সব ভাইয়ের চেয়ে বেশী করেছে, তবু ডাইনে আনতে ওর বাঁয়ে কুলোয় না কেন! ষাটটি টাকা মাইনে, আর দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে কুড়িটি! এখন ভালয় ভালয় এখানে থেকে যেতে পারলে বাঁচি মা!

আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংলগ্ন হোক আর নাই হোক্, যুক্তি যে অখণ্ডনীয় তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে! খবরটা মেজ বধূ সেজ বধূকে এই ভাবে জানাইলেন, তাহার মধ্যম ভাসুর যে গো-বধ করিয়াছেন, তাহার জন্য সেই দায়ী।

প্রিয় কিছু বুঝিল না, তবে ভিতরে ভিতরে আরো শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

মেজ বধূ বলিলেন, দিদি রায় দিয়েছেন। ওর ওপর আর আপীল নেই, তা জানিস্ ত!

প্রিয় কাঁদিয়া ফেলিয়া মেজ বধূর দু'টা পা-ই চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মেজ দি, আমার এ শাস্তি কেন!

মেজ বৌ শৈল রাগিয়া উঠিয়া বলিল, চুপ কর বাঁদরি। গায়ে তোর ফোস্কা পড়েছে নাকি! দেখি, কতগুলো ফোস্কা পড়লো, বলিয়া তাহার গায়ের কাপড় সরাইয়া ফোস্কা খুঁজিতে লাগিল।

চার

খগেনটা মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার রাক্ষস! আম বাগানটা খ্যাঁদা মুখুজ্জের কাছে তিন হাজার টাকায় বাঁধা রাখিয়াছে, খবর বাহির হইয়া পড়িল। আইনতঃ কাজটা অসিদ্ধ বটে কিন্তু সে ত আদালতের ব্যাপার! কিন্তু কি স্পর্দ্ধা, দাদাদের জানানোটাই দরকার বোধ করিল না। তাহার দাদারা তেমন লোক নয়, তাই, নহিলে তাহাকে জেলে দিয়া তবে ছাড়িত। বড় কর্ত্তার ঘরে বড় কর্ত্তার সামনেই যখন এই সব আলোচনা হইয়া সিদ্ধান্তও প্রায় হইয়া গেল, তখন অপরাধী সেই যে ঘাড়টা নীচু করিয়া খুঁটির মত বসিল, তাহার মুখ দিয়া একটা অক্ষরও বাহির করা গেল না।

রেল কোম্পানী ত ওসব শুনবে না, তারা—বলিতে বলিতে বড় কর্ত্তা স্নান করিতে চলিয়া গেলেন; মেজ কর্ত্তা নগেনও "বেলা হল" বলিয়া উঠিলেন। খগেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি করি মেজ দা, ও বছর নিজের হোল টাইফয়েড, সাতাশ দিন যমে মানুষে টানা হেঁচড়া চলতে লাগল। আমি যদি বা উঠলুম, ও পড়ে গেল। বাঁচবার আশা ত ছিলই নাই, তিন চার মাস ধরে এখন যায় তখন যায় করে কোন গতিকে—

নগেন বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, পাড়াগাঁ জায়গা বড় বিশ্রী।

খগেন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, তোমাদের না জানানোটা আমার অপরাধ হয়েছে স্বীকার করছি। কিন্তু তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিল মেজ দা? তুমিই বল। আমরা যদি বা উঠলুম, ছেলেটার

হোল ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। এই পাঁচটা বছর ধরে আমার যে কি করে দিন যাচ্ছে, সে আর কি বলবো তোমাকে! ঐ গোয়াল বাড়ীটাও—

নগেন সবিস্ময়ে কহিল, সেটা আবার কি করলি?

খগেন চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া নগেন পুনরায় জিজ্ঞাসিল, ওটা কি করলি? ওটাও বাঁধা দিইছিস্ নাকি?

খগেন বলিল, ও আর বাঁধা রাখবে কে! ওটা বেচেছি।

বেচিছিস্? কত টাকায় বেচলি?

হাজার টাকা।

নগেন রাগ করিয়া বলিলেন, দাদাকে বল্‌গে; আমি ও সব কথার মধ্যে নেই।—বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, খগেন সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল, জলা মাঠের কুড়ি বিঘে জমি ভাগে বিলি ছিল না—

তা'ও বেচে দিয়েছ? বেশ করেছ! যাও ওদিকে, বলিয়া নগেন অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। খগেন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। মেজ বৌ'কে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া বোধহয় নিতান্ত লজ্জাবশতঃই চলিয়া যাইতেছিল, শৈল ডাকিলেন, ঠাকুরপো, শোন।

তাঁহার শান্ত কণ্ঠস্বরে খগেন ভরসা পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে তিনি বলিলেন, পুরুতমশাই ত গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত সোনা আর ধান নিয়েই খুসী হয়ে চলে গেলেন, তাঁর বোধহয় বছর দুয়ের হিল্লে হয়ে গেল, তা হোক্। কিন্তু ভাই, আমার মনের খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছে না। আমার ইচ্ছে, গুটি কতক ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে শুদ্ধ হই। জানই ত, ছেলে দুটো সেই কোন্ সাত সমুদ্দুর পারে পড়ে রয়েছে।

তার আর কি বৌদি। আমি আজই ব্যবস্থা করে ফেলছি।

কর। আর দেরী করো না কিন্তু। শুনছি কাল এখানকার কাজ-কর্ম্ম মিটে যাবে, সাহেবরা কালই টাকা কড়ি দিয়ে যাবে, দিদিরা পশুই নাকি চলে যাবেন। ওঁরা থাকতে থাকতে—

বেশ ত, কালই হবে বৌদি।

হ্যাঁ ভাই, তাই করো। একটু থামিয়া আবার বলিলেন, তোমার গাঁ ত দেখলুম বন আর জঙ্গল। গুটি পঞ্চাশ বামুন খুঁজে পাওয়া যাবে ত গো?

খগেন হাসিয়া বলিল, পাওয়া শক্ত, বৌদি। দেখি যতগুলি হয়।

মেজ বৌ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আর একটি কাজ করো ঠাকুরপো, ঐ সঙ্গে সেই যে তোমাদের খবরের কাগজের ভাষায় দরিদ্র নারায়ণ না কি বলে—

সে অনেক আছে, যত চান্।

না, না, যত-টত নয়। শ' খানেক—বেছে বেছে, খুব গরীব দেখে—

তাদেরও কি বসে খাওয়াবেন বৌদি?

তুমি কি বলো?

আমি বলি কি, নগদ পয়সা—

না, না, খাওয়ানতেই আনন্দ, ভাই। তুমি সব আয়োজন করে ফেল ভাই, কালকের জন্যে।—খগেনের আরও কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, রাঁধবার বামুন টামুন তোমাদের দেশে পাওয়া যায় ত?

খগেন বলিল, রসুয়ে বামুন পাওয়া যায় না বটে, তবে যাঁরা ভোজন করবেন, রন্ধনটা তাঁরাই করে নেন, এই এখানকার রীতি।

সে সব আমি জানি নে, আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। সেজ বৌয়ের কাছে আমি টাকা রেখে এসেছি।

এর মধ্যে টাকা রেখে আসাও হয়ে গেছে? খগেন হাসিল।

শুভ কাজ, বিলম্ব করতে আছে? শৈলও হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

বহির্বাটির আকাশে যে তুমুল ঝড়ের সূচনা হইয়াছে, বাড়ীর একাংশে নিভৃতে বসিয়াও প্রিয় তাহার খবর পাইতেছিল এবং শঙ্কায় চিন্তায় কাঁটা হইয়া ছিল! প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা হইতেছিল, একটা বিরাট চেঁচামেচি, গালি গালাজ, আরও কত কি সুরু হইয়া যাইবে; অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার দীন দরিদ্র অভিমানী স্বামী একটা কিছু না করিয়া বসেন, সে ভয়ও বড় কম ছিলনা। আব্দুল মাছ দিতে আসিয়া দিবুকে লইয়া গিয়াছে, কাছের কোন্ একটা গ্রামে ধর্ম্মতলার মেলা বসিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া আনিবে বলিয়া গিয়াছে। ছেলেটা যে কাছে থাকিয়া বাপ-মায়ের শত লাঞ্ছনা দেখিবে না, ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা। প্রিয় নিজের ঘরের জানালার কাছে বসিয়া বোধ করি নিজের হৃদয়ের স্পন্দনগুলি গণনা করিতেছিল, এমন সময়ে স্বামীকে হাসিমুখে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া মনে মনে মা দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

খগেন বলিল, বৌদি টাকা রেখে গেছেন?

এই যে!—বলিয়া প্রিয় আঁচলে বাঁধা নোটগুলা খুলিয়া স্বামীর হাতে দিতে গেল, খগেন জিজ্ঞাসা করিল, কত? প্রিয় বলিল, তা আমি জানব কি করে! দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন, ঠাকুরপো জানে!

গণিয়া দেখা গেল পাঁচ শত টাকা। খগেন নিজের মনেই বলিল, কিন্তু এত লাগবে না ত।

প্রিয় বলিল, কি হবে গা ?

খগেন ব্যাপারটা বলিলে, প্রিয়বালার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; বলিল, সত্যিই ত! কোন্ দেশের কুলে রাজ্যের কুলে পড়ে আছে বাছারা! মা'র মন ত! ভাল করে কাজটা করে দাও!—বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেও ত মা! তারও ত মায়ের মন!

যাই, গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে পরামর্শটা করে আসি—বলিয়া খগেন বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে, প্রিয় বলিয়া উঠিল—হ্যাঁগা, কি হল ?

খগেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিসের ?

প্রিয় বলিল, না, তুমি যাও।

যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা হইবেই ভাবিয়া প্রিয় অপ্রিয় প্রশ্নটা সম্বরণ করিয়া লইল। মেজ বৌ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে সেজো, তোর কাণ্ডকারখানাটা কি বল ত ?—হঠাৎ দেখিলেন, সেজ বৌয়ের চোখে জল। থামিয়া গিয়া, কাছে আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিলেন, কি হয়েছে রে সেজো ?

না দিদি, কিছু হয় নি। বলিয়া প্রিয়বালা চোখ মুছিয়া ফেলিল। মেজ বৌ অভিমানভরে বলিলেন, আমায় বলবি নে ত, আচ্ছা থাক্।

ও কিছু নয় দিদি। তুমি যে কি বল্‌তে এসেছিলে।

সে ভুলে গেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, দিবু কৈ, আজ তার জন্মবার না? তার নতুন জামা কাপড় এসেছে, পরে তার জ্যাঠার সঙ্গে ভাত খাবে।

প্রিয়র চোখে আবার এক ঝলক জল আসিয়া পড়িল। বলিল,

আব্দুলের সঙ্গে কোথায় মেলা দেখতে গেছে, একটু পরেই আসবে দিদি।

এলেই আমায় খবর দিস্। তোর ভাশুর এসেই মুহুরীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন দিবুর জামা টামার জন্যে। এখন পার্শেল এল।

প্রিয়বালা চোখের জলটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, দিদি, কাল বামুন খাবে?

ঠাকুরপোকে টাকাটা দিইছিস্?

হ্যাঁ। বল না—খাবে?

হ্যাঁরে, হ্যাঁ।

সেই সঙ্গে আর একটি কাজ করবে দিদি? উনি বলছিলেন, বামুন খাওয়াতে অত টাকা লাগবে না। তাই—

কথাটা কি বল্ না।

প্রিয়বালা নতমুখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, বিশু খোকা ত সেই কোন্ দূর দেশে রয়েছে, তাদের নাম ক'রে সত্যনারায়ণের জোড়া সিন্নী দেওয়া হয় আমার এই বড় ইচ্ছে। বাড়ীতে অনেক দিন কোন ভাল কাজ হয় নি, দিদি, আমরা ত বৃথা মনিষ্যি, কখন কিছু করতে পারিনে, জানো ত সব, তুমি এসেছ, বাছারাও রয়েছে—

মেজ বৌয়ের বুকের ভিতরেও ঝড় বহিতেছিল, প্রিয়র সজল মুখখানি বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, সিন্নি দিবি, তা দে না ভাই, তুই ত তাদের কাকী। দিবু-ও যা, খোকা বিশুও তাই। তুই ঠাকুরপোকে বলে সব জোগাড়-যাগাড় কর ভাই, টাকার জন্যে ভাবিস্ নে।

লোকেন বাহির হইতে ডাকিল, মেজ বৌদি! ভিতরে আসিয়া বলিল, চোখ মোছামুছির পালা চল্‌ছে বুঝি? তা বেশ, শেষ ক'রে আপনি একবার যাবেন, বড় বাড়ী সেলাম দিয়েছেন। বলিয়াই চলিয়া গেল।

মেজ বৌ হাসিয়া বলিলেন, আমার দায় পড়েছে এই দুপুর রোদে সেলাম বাজাতে যাবার।

দুপুর রৌদ্রে এঘর হইতে ওঘরে যাইতে কষ্ট না-হয় নাই হইল কিন্তু যে জন্য ডাক পড়িয়াছে, গেলে যে কথা উঠিবে তাহা জানা ছিল বলিয়াই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল এবং "দিবু এলেই আমাকে ডাকিস্" বলিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পরদিন যে ঘটনা ঘটিল, তাহাকে নাটকীয় বলাই সঙ্গত। এমন কি, মেলো ড্রামাটিক বলিলে আরও শোভন হয়। বড় কর্ত্তার ঘরে বসিয়া রেল-আফিসের বাবুদের সঙ্গে যখন দরকসাকসি হইতেছে, নানা ইসারা সঙ্কেত সহযোগে আপোষের কথাবার্ত্তাও চলিতেছে, সেই সময়ে এদিকের উঠানে ছেঁড়া পাল টাঙ্গাইয়া চাটুয্যে মহাশয় গ্রামের আরও কতিপয় ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট ব্রাহ্মণকে সহকর্ম্মী করিয়া গোটা চারেক কাঠের চুলি জ্বালাইয়া—সে এক বিরাট ব্যাপার; আবার ঠাকুরদালানের মাঝখানে চিত্র বিচিত্র আলিপনা দিয়া সেজ বৌ সত্যনারায়ণের সিরণির আয়োজন করিতেছে। মেজ বৌ কোথায়ও দু' দণ্ড স্থির হইয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে পারেন না, একবার এখান, একবার ওখান করিয়া বেড়াইতেছেন। কাল রাত্রেই উপবাস করিবার কথা হইয়াছিল, মেজ বৌ বলিয়া দিলেন, কাকী ভাসুরপোদের কল্যাণে সিন্নী দিচ্ছে, আমি কেন উপোস করে মরতে

যাব ? যার সিন্নী, তার উপোষ ! কাজেই উপবাস প্রিয়ই করিয়াছে। এ সব সে খুব পারে।

খগেন বাজার হাট শেষ করিয়া, মাথায় দু' ঘটি জল দিয়া একটু জল খাইতে বসিয়াছে, বড় বাবুর চাকর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, বড় বাবু আপনাকে ডাকছেন, শীগগির।

খগেনের মুখ শুকাইয়া গেল। আধখানা সন্দেশ তখনও হাতে, উঠিয়া পড়ে, মেজ বৌ ধীরকণ্ঠে বলিলেন, আগে জল খেয়ে নাও, তার পরে যেয়ো। চাকরটাকে বলিলেন, বল্‌গে, সেজ বাবু জল খাচ্ছেন।

উঠান হইতে চাটুয্যে মহাশয় ভয়ানক চেঁচাইয়া বলিলেন, বলি মাষ্টার, শাক টাক গুলো রাখলে কোথায় হে ? বেলা কত হোল, হুঁস রাখ ?

মেজ বৌ তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, তোরা একটু দেখতেও পারিস না—সে ছুটিয়া গেল।

চাটুয্যে মহাশয় পুনরায় হাঁকিলেন, বলি, মাষ্টার, গেলে কোথায় হে ?

আসছি, বলিয়া খগেন সেইদিকে ছুটিল। বড় বাবুর চাকরটা তাহাকেই ধরিতে আসিতেছিল, মেজ বৌ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, কি, চাস্ কি ?

চাকর থতমত খাইয়া বলিল, বড় বাবু বড্ড রাগ করছেন, উনি না গেলে—সাহেবরা—

মেজ বাবু কোথায় ?

সেখানেই আছেন।

মেজ বৌ কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, মেজ বাবুকে আমার নাম ক'রে বল্‌গে যা, সেজ বাবু আমার কাজে ব্যস্ত আছেন, এখন যেতে পারবেন না।

চাকর যে আজ্ঞে বলিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু মেজ বৌ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যাহারা পুনঃ পুনঃ ডাকিতেছে, তাহারা কি অত সহজে নিষ্কৃতি দেয়? ঠিক তাহাই। এবার লোকেনের পালা। মেজ বৌ তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, তোমাদের চাকরটা তোমার মেজ দা'কে বলে নি গিয়ে?

লোকেন বলিল, বলেছে। কিন্তু উনি বাগান, বাড়ী, জমি সবই ত বাঁধা দিয়ে বসে আছেন, সেগুলো খালাস করে দেবেন, না ওঁর পাওনা টাকা থেকে দিয়ে খালাস করা হবে সেটা ত ওঁর কাছ থেকে জানা দরকার। একবারটি উনি যেতে পারেন নাই বা কেন!

প্রিয় গোলমাল শুনিয়া এইমাত্র আসিয়া দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, লোকেন তাহা দেখিতেছিল কিন্তু এমন করিয়া মুখটা ফিরাইয়া কথা বলিতেছিল, প্রিয়র দিকে না দেখিতে হয়। মেজ বৌ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, ঠাকুরপো, ঐ ত দু'খানা হাড়, শরীরে না আছে পদার্থ, না আছে সামর্থ্য, পাঁচ জনের সামনে নিয়ে গিয়ে কেন অপদস্থ করবে? কথা মুখ দিয়ে বেরুবেই না, ধমক ধামক খেলে হয়ত বা মাথা ঘুরে পড়ে টড়েও যেতে পারে। তার চেয়ে ওঁদের বলে দাও গে, ঘরে ওর কাণা কড়িটিও নেই, যদি ওর পাওনা গণ্ডা কিছু থাকে, তাই দিয়ে দেনা খালাস্ করে ওঁরা বেচে টেচে যা করবার করুন। ওকে বলাও যা, না বলাও তাই!

লোকেন অন্যদিকে মুখ করিয়াই বলিতে লাগিল, তবু কোন্‌টার জন্যে কত টাকা, সেটাও ত জানা দরকার। যারা বাঁধা রেখেছে, তাদের কথাই যে ঠিক, তা জানা যাবে কি করে!

প্রিয়বালা আশ্চর্য্য উত্তর দিল, তাঁরা মিথ্যে বলবেন কেন ঠাকুরপো! আর যদিই বলেন, বড় বিপদের সময়ই তাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, যদি কিছু বেশী বলেন, বললেনই বা ! তুমি সেই কথা ওঁদের বুঝিয়ে বলগে ভাই।

লোকেন তবুও মুখ তুলিল না, বলিল, তাই বলি গে, কিন্তু মিটবে ব'লে মনে হচ্ছে না। বড় বৌদি——এই যে—বলিয়াই ত্রস্তে নামিয়া গেল।

বলি সেজ বৌ—

মেজ বৌ তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, আমরা থাকতে এই তুচ্ছ কথার জন্যে তোমার ঐ রোগা শরীরে না নামলে কি হচ্ছিল না দিদি !

রোয়াকের একপাশে বসিয়া দুটি ব্রাহ্মণ বালক তরকারী কুটিতেছিল, তাঁহার রোগা শরীরের উল্লেখে তাহারা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। একজন আলু কুটিতে গিয়া একটা আঙুলই কুটিয়া বসিল। রক্তের ধারা ছুটিল, প্রিয় রেড়ীর তেল নেকড়া আনিতে ঘরে ঢুকিল, মেজ বৌ ফার্ষ্ট এডের বাক্স খুঁজিতে গেলে, বড় বধূ শ্বাস প্রশ্বাসে বড় কষ্ট দেখিয়া, কি আর করেন, থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

পল্লীগ্রামের পর্দ্দা কড়া বা নরম যেমনই হোক্ না কেন, কাজকর্ম্মের বাড়ীতে পর্দ্দা থাকে না বলিলেই হয়। প্রিয় বেঞ্জোইনে তুলা ভিজাইয়া ছেলেটির হাতটায় লাগাইয়া দিতে রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। ছেলেটারও কড়া জান্ বলিতে হইবে, সেই আঙুলটা বাঁচাইয়া সে আগের মতই আলু ছাড়াইতে লাগিল।

প্রিয় যখন ছেলেটার হাতের পরিচর্য্যা করিতেছিল, মেজ বৌ আসিয়া বড় বধূর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, যখন দেখিলেন, হাতের কাজ প্রায় শেষ

হইয়া আসিয়াছে, তখন বলিলেন, তুমি চলো দিদি, আমি ওকে ডেকে পাঠিয়ে সব মীমাংসা করে দিচ্ছি। তোমার এই অসুখ শরীরে বারবার ওঠা নামা সহ্য হয় কখনও ?

ছেলে দু'টা আবার মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। মেজ বৌ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে বলিলেন, দেখো বাবা, আবার আঙুল টাঙুল কেটে বসো না যেন! তারপর একরকম জোর করিয়াই বড় বৌকে লইয়া গেলেন। মীমাংসাটা কিরূপে হইল তাহা জানা গেল না বটে, তবে সিদ্ধান্ত এইরূপ হইল যে বাগান ও বাড়ীটা রেল কোম্পানী বার হাজার টাকায় কিনিয়া লইলেন। চার ভায়ের তিন হাজার করিয়া পাওয়ার কথা, কিন্তু খগেনের তিন হাজার টাকা দেনা শোধ হওয়ায় সে কিছুই পাইল না। শুনিয়া প্রিয়বালা বলিল, তা না পাকৃগে, দেনাটা ত গেছে, সেই ঢের। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। বাড়ী যখন রেল কোম্পানীর হইল, তখন খগেন থাকিবে কোথায় ? গোহাল বাড়ীটা খগেন বিক্রয় করিয়াছে, এখন ইচ্ছা করিলে টাকা কড়ি যোগাড় করিয়া সেই টাকাটা ফেরৎ দিয়া বাড়ীটা খালাস করিয়া ওখানেই থাকিতে পারে। এইবার প্রিয়র মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেনা শোধ করিয়া তবে থাকিতে পারা যাইবে ? দেনাও ত কম নয়, হাজার টাকা আসল, তার ওপর সুদ আছে। কোথায় পাইবে এতো টাকা।

রেল কোম্পানীকে ঐ গোহাল বাড়ীটা গছাইয়া দিবার বিধিমত চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাদের মাপ জোপের ব্যাপার, বলিল, এক ছটাক বেশী বা এক কাচ্চা কম লইবার স্বাধীনতাও নাই।

গোহাল বাড়ীটা এককালে মস্ত ব্যাপারই ছিল। বিরাট রাজার

গোশালার মত ব্যবস্থা। এখন তাহার ভগ্ন দশা। সাপ খোপের বাসস্থল। যাহারা কিনিয়াছে, তাহারা ইটের দামেই লইয়াছে; ভাঙ্গিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া ইট লইয়া গিয়া অন্যত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিবে! কথা আছে, তাহারা শীতের গোড়াতেই ভাঙ্গাভাঙ্গি সুরু করিবে।

খগেনকে এ পরামর্শও দেওয়া হইয়াছে, ঐ গোহাল বাড়ীটা সারাইয়া লইয়া যতদিন ইচ্ছা সে বাস করুক, ভায়েরা আপত্তি করিবেন না। খগেন বলিতে চেষ্টা করিল, সে কি ক'রে হবে? তারাই বা ছাড়বে কেন? আমিই বা অত টাকা—! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!

পুরোহিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথা পড়িয়া যাইতেছেন, বাড়ীসুদ্ধ লোক, পাড়ারও অনেক লোক নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতেছে, প্রিয়ও একধারে বসিয়াছিল। 'কথা'র একটিও তাহার কাণে যায় নাই, দু'টি চোখে তাহার সহস্র ধারা বহিয়া যাইতেছিল, সিংহাসনোপবিষ্ট নারারণ শিলার পানে চাহিয়া সে মনে মনে এই কথাই শুধু বলিতে চাহিতেছিল, ঠাকুর, আমার হাতের এই কি শেষ সিন্নীই আজ তুমি খেলে? আর কখনও কি খাবে না?

যাহারা সত্যনারায়ণের সিন্নী দেয়, তাহাদের একখানা পিঁড়ে থাকে; পূজার পরে এই পিঁড়া খানিকে তাহারা বড় যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখে। প্রিয় পিঁড়িখানিকে মাথায় করিয়া শোবার ঘরের কোণে নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিয়া, চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, লোকেন দাঁড়াইয়া। হঠাৎ এ সময়ে, একা ঘরে আসিবার হেতুটা জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি সামর্থ্যও তাহার ছিল না। সারাদিন উপবাস, তার উপর—। যাক্। লোকেন বলিল, বৌদি বেশী কথা বলবার

আমার সময় নেই এখন। এই জিনিষটে এখন রেখে দিন, পরে কথা হবে।—বলিয়া কি একটা কাগজ তাহার সামনে ধরিল। প্রিয় বলিল, ওতে কি আছে ঠাকুরপো? "আমার অংশের টাকাটা, রাখতে দিচ্ছি আপনার কাছে" বলিয়া তাহার নিজের বয়সটাও ভাবিল না, বৌদির মর্য্যাদাটাও রাখিল না, প্রিয়র হাতটা টানিয়া কাগজগুলা গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে খগেন বলিল, তার আর কি হয়েছে! যাবার সময় নিয়ে যাবে'খন, ভাল করে রেখে দাও।

পরদিন বড় পক্ষ সকালেই বিদায় লইলেন, অর্থাৎ গৃহ সরগরম করিয়া চলিয়া গেলেন। মেজ বৌ, সেজ বৌ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, বড় বধূ কোন কথাই বলিলেন না। লোকেন তাহাদের সঙ্গে যাইতেছে দেখিয়া প্রিয় ডাকিল; বলিল, সেটা এনে দিই?

লোকেন বলিল, আমি ইষ্টিসান থেকেই ফিরবো যে!

মেজ ও সেজ বৌ উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। লোকেন বলিল, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ—ফিরে এসে বলছি।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে মেজ বৌ বলিলেন, চল, গোয়াল বাড়ীটা দেখি গে।

দিবুকে কোলে লইয়া তাঁহারা সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, নগেন ও খগেন সেইখানে এবং নগেন খগেনকে ভয়ানক ধমকাইতেছেন, ও শীতকাল টিতকাল বুঝি নে, তারা ইঁট নিয়ে এখনই চলে যাক্। এক মাস কোর্ট বন্ধ আছে, থেকে আমি দু'খানা ঘর ক'রে দিয়ে তবে যাব। তাদের তিনদিনের নোটিশ দিয়ে এস, তার মধ্যে ইঁট নিয়ে

যায় ভাল, নইলে পাবে না। পারে, আমার সঙ্গে মামলা করে যেন।

খগেন কি বলিতে গেলে, তিনি আরও জোরে ধমক দিয়া বলিলেন, ও মাসের ১লা রেল কোম্পানী বাড়ীর দখল নেবে, তখন তুমি কি ছেলে পুলে নিয়ে এই ভাগাড়ে ঢুকবে! আমি কোন কথা শুনতে চাই নে, তুমি এখনি তাদের কাছে যাও, বলে এস। আমি আব্দুলকে ডেকে পাঠিয়েছি, চুণ শুরকী কাঠ কাটরা জন মজুর সব সেই জোগাড় করবে বলেছে।

খগেন আবার হাঁ করিয়া কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তিনি বলিলেন, আমি যা বললুম তাই করগে, আর কথা কাটাকাটি করবার দরকার নেই। আর একবার একটু এগিয়ে আব্দুলকে দেখ, জলায় আমার হাঁস মারতে যাবার কথা আছে। এমন হতচ্ছাড়া দেশ—একটা ঘুঘু পর্য্যন্ত মেলে না। বন্দুক দু'টো আনাই সার হোল!—বলিয়া তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

খগেন মেজ বৌয়ের কাছে কৃতজ্ঞতাসূচক একটা কি বলিবার চেষ্টা বোধকরি করিতেছিল, মেজ বৌ বলিলেন, কি রকম চটে আছে, দেখলে ত, দেরী করো না ভাই, যাতে শীগগির শীগগির হাঁস হোক্, ঘুঘু, পায়রা চড়াই শালিখ যা হোক্ দু'টো শিকার হয়, তারই ব্যবস্থা করো গে।

কিন্তু তুমি সব শুনেছ ত? দাদা আমাদের জন্যে এটা ভেঙ্গে—

শোন ঠাকুরপো, তবে বলি। যতটুকু তুমি শুনলে, ঠিক ততটুকু

আমিও শুনলুম, তার বেশী জানিও নে, জানতে চাইও না! আর কেন চাইনে, জান?

খগেন মুখ তুলিয়া চাহিল।

মেজ বৌয়ের গলাটা ধরিয়া আসিতেছিল, যতখানি পারিলেন সহজ করিয়া বলিলেন, ত্রিশ বছর ঘর করে এই কথাটা বুঝেছি ঠাকুরপো, ঐ লোকটা মানুষ আর কাজও যা করে, মানুষের মতই করে। বলিয়াই তিনি বাম হাতে চোখ দু'টা মার্জ্জনা করিয়া লইয়া আবার বলিলেন,তাই, যতটুকু ও নিজে বলে, ততটুকুই শুনি, তার বেশী শুনিও নে, শুনতে চাই-ও নে। কিন্তু দোহাই তোমারও, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করো না ভাই; হাঁসগুলো হয়ত এতক্ষণে কেষ্ট কেষ্ট করছে, ওঁরা পৌছতে যা দেরী।

খগেন চলিয়া গেলে, প্রিয়কে বলিলেন, তবে আর গোয়াল দেখে কি হবে? ফিরি চ! দে ওকে, আমার কোলে দে।

প্রিয় চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, ও হেঁটেই চলুক দিদি।

কেন, হাঁটবে কেন? দু'দুটো বাহন ওর!

উঁহু, দু'টো নয়—তিনটে, বলিয়া পাঁচীল টপকাইয়া লোকেন আসিয়া হাজির। দিবাকে কাড়িয়া লইয়া, কাঁধে বসাইয়া, চলিতে চলিতে বলিল, আচ্ছা বৌদি, তুমি কি মন্তর জান? আমি সেজ বৌদিকে জিজ্ঞেস্ করছি! বুঝতে পারলে না? তবে অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করো। তুমি যদি ডাইনী না হবে, তাহ'লে শান্ত শিষ্ট সৎ লোকেন রেল কোম্পানীর সাহেবের হাত থেকে তার ভাগের টাকাটা পরম পূজনীয়দের হাতে দিতে না ব'লে স্বয়ং নিজের হাত পেতেই বা নেবে কেন এবং সেটা

লুকিয়ে রাখবেই বা কেন ? ভাইনীর পরামর্শ ছাড়া কি এ সব হবার যো আছে !

মেজ বৌদি হাসিয়া বলিলেন, দিদি বলেছেন ঐ সব কথা !

এইরূপ প্রকাশ। যাক্, তোমারই বোঝা বাড়ল বৌদি। বি-এটা দিতে ত হবে, তোমার চুঁচড়োর বাড়ীতেই অবস্থান।

মেজ বৌ আহ্লাদে গদ-গদ হইয়া বলিলেন, সত্যি ত !

সত্যি কেন, তিন সত্যিও বলা যায়।

বাঁচলুম ভাই, একা থাকি, কি যে কষ্ট ! তার ওপর ঐ মনিষ্যি, না কথা শোনে ! না কথা বলে !—বলিয়া হাসিলেন।

লোকেন বলিল, শোন বৌদি, মেজ বৌদি, তুমিও শোন, টাকাটা যে তোমার কাছে রেখেছি, তার কারণ আছে। ঘর দোর ত গেল, অথচ এটার থাকবার একটা জায়গাও ত চাই। ঐ দিয়ে একটা কুঁড়ে-টুঁড়ে যা হোক্—

মেজ বৌ হাসিয়া বলিলেন, সে ব্যবস্থা তোমার মেজ দা' করেছেন ঠাকুরপো। ঐখেনে ছোট একখানা—বলিয়া শৈল যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত করিলেন।

লোকেন বলিল, মেজ দা তাঁর যোগ্য কাজই করেছেন। কিন্তু সে সব হল রাম সীতা লক্ষণের ব্যাপার। ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীটারও ত কিছু করা চাই, বলিয়া সে দিবুর পিঠে—একটা চিমটি কাটিয়া বলিল, কাঠবিড়ালী কি করেছিল, কাকু !

দিবু মধ্যস্থতা করিতে পাইয়া উচ্ছ্বসিত হাসিতে প্রায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, সেতুবন্ধ করেছিল, না কাকু ? সেই সেতু দিয়ে রাম সীতা লক্ষণ সমুদ্দুর পার হয়ে এসেছিলেন। ঠিক না কাকু ?

কাকু তাহাকে বুকের ভিতর পুরিয়া চাপিতে চাপিতে বলিল, ঠিক কাকু ঠিক! কিন্তু এখানে আর নয় কাকু, ওঁরা সব ধন্যবাদের পালা গাইবেন বলে মনে হচ্ছে। তার চেয়ে চলো কাকু, আমরা হাঁস শিকারে যাই। হাঁস আজ চাই ই চাই। নইলে নেকড়েব বদলে গরু হয়ে গেছে এবার নরমেধযজ্ঞের পালা।

শেষ